মুসলিম সভ্যতার ১০০১ আবিষ্কার— মিরাজ রহমান ও মো. আবুল বাশার

প্রথম প্রকাশ— অমর একুশে বইমেলা ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব— আমাতুল্লাহ ইউসরা দোআ

প্রকাশক— সুলতানস

অ্যাসোসিয়েট পার্টনার— ইসলাম প্রতিদিন

প্রচ্ছদ— আবুল ফাতাহ মুন্না

অলংকরণ— আনোয়ার হোসেন, রেদওয়ান ইসলাম নাফিজ

বানান সংশোধন— খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম

সুলতানস টিম— তামীম হুসাইন শাওন, ফেরদৌস রহমান সেলিম ও অলংকারকদ্বয়

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা— মা-মনি প্রিন্টার্স

যোগাযোগ— বাসা : ৩৩, রোড : ০৫, ব্লক : ই, সেক্টর: ০১, আফতাব নগর, ঢাকা-১২১২

মোবাইল— ০১৮১০০১১১২৫, ০১৮৫৬১৪৪৪৪১; **ইমেইল**— sultaansbd@gmail.com

মূল্য— ৭০০ [সাত শত] টাকা

1001 INVANTIONS OF MUSLIM CIVILIZATION—
Miraj Rahman & Md. Abul Bashar
FIRST PUBLICATION— Amor Akushe Boimela 2022
COPY RIGHT— Amatullah Yusra Duaa
PUBLISHER— Sultaans
ASSOCIATE PARTNER— Islam Pratidin
COVER DESIGN— Abul Fattah Munna
DECORATION— Anowar Hossen, Redwan Islam Nafis
PROOF READING— Khandokar Jahangir Alam
PRINT MANAGMENT— Ma-Moni Printers
CONTACT— House : 33, Road : 05, Block : E, Sector : 01, Aftab Nagar, Dhaka-1212
Phone — 01810011125, 01856144441; Email— sultaansbd@gmail.com
PRICE— US $ 10.00, BDT : 700/-
ISBN— 978-984-35-1844-6

অনলাইন পরিবেশক— www.BoiBazar.com । www.Rokomari.com । www.wafilife.com

কপিরাইট © সুলতানস (sultaans)। সুলতানসের লিখিত অনুমতি ছাড়া 'মুসলিম সভ্যতার ১০০১ আবিস্কার' নামক গ্রন্থের লেখা-তথ্য-ছবি এবং ডিজাইনের কোনো অংশের ডিজাইন বা প্রকাশনাগত পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপিকরণ অথবা গ্রন্থ বা পুস্তিকা আকারে অথবা কোনো প্রকারের কোনো (ছোট-বড়) প্রকাশনা করা যাবে না।
যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোনো উপায়-পদ্ধতি অবলম্বনে এই গ্রন্থের কোনো প্রকারের কোনো ডিজিটাল (অডিও-ভিজুয়্যাল) কনটেন্ট তৈরি করা, প্রচার, প্রকাশ, স্থানান্তর ও তথ্য সংরক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

সুলতানস থেকে

সুলতানস চেয়েছে বিজ্ঞানের সুলতানদের নিয়ে কাজ করতে। মুসলিম সভ্যতার গৌরবগাথাকে তুলে ধরতে। সুলতানি ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে প্রকাশনায় পদার্পণ ও বিরাজ করার স্বপ্ন দেখে সুলতানস। এক আকাশ স্বপ্নের শুভযাত্রায় সুলতানসের প্রথম প্রকাশনা হিসেবে 1001 Inventions : The Enduring Legacy of Muslim Civilization নামক বিশ্ববিখ্যাত বইটির বাংলা অনুবাদগ্রন্থ 'মুসলিম সভ্যতার ১০০১ আবিষ্কার' পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সুলতানস পরিবার ধন্য। সুলতানসের এ পথচলা আরও দীর্ঘ হোক, হোক মসৃণ। আমিন।

প্রকাশক, সুলতানস
sultaansbd@gmail.com

আমার '১০০১ আবিষ্কর' যাত্রা

ইন্টারনেট নামের এক সাগরে 'প্রিয় ইসলাম' নামক একটি জাহাজের নাবিক ছিলাম আমি— সময়কাল ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। ইসলামবিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও ব্যতিক্রমধর্মী ফিচার তৈরির আগ্রহে দিন-রাতের উল্লেখযোগ্য একটি সময় কাটত নেটব্রাউজিংয়ে।

হঠাৎ একদিন চোখ আমার ছানাবড়া— www.1001inventions.com শিরোনামের একটি ওয়েবসাইট খুঁজে পেলাম এবং তাদের আয়োজন দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হলাম। ইতিহাসের দীর্ঘ একটি অধ্যায়কে গোটা বিশ্বের ঐতিহাসিক মোড়লরা যখন 'ডার্ক এইজ' আখ্যা দিয়ে স্বস্তির ঢেঁকুর তুলছে— ঠিক তখন ১০০১ আবিস্কার নামে মুসলিম সভ্যতার অবদানের শেকড় সন্ধানী একটি শুভযাত্রার সূচনা ঘটিয়েছেন মানবসমাজের কল্যাণে নিবেদিত কিছু বিদ্বজ্জন। প্রফেসর সেলিমের নেতৃত্বে একদল গবেষক 'ডার্ক এইজ' নামের সময়কালটিকে 'গোল্ডেন এইজ' প্রমাণের মিশনে নেমেছেন— বিশ্ব সভ্যতার নানাবিদ উন্নয়ন ও আবিষ্কারের নেপথ্যে মুসলিমদের অবদানের সঠিক ইতিহাসকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে পুনঃউন্মোচন করতে কাজ করছেন তারা।

বিস্মিত হলাম, আপ্লুত হলাম এবং খুশিতে ভুলে গেলাম নাওয়া-খাওয়াও। 1001 Inventions : The Enduring Legacy of Muslim Civilization নামে প্রকাশিত বইটির পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করার অহেতুক প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটল সে রাতের ফজরের আজান শুনে। ফজরের নামাজ পড়ে বিছানায় গেলাম চরমভাবে আকাঙ্ক্ষিত একটি বই ডাউনলোড করতে না পারার বেদনা বুকে নিয়ে...

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে 1001 Inventions : The Enduring Legacy of Muslim Civilization নামক বইটির প্রিন্ট ভার্সন হাতে পেলাম রকমারি ডট কমের বদৌলতে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে— বইটি হাতে পাওয়ার পর দীর্ঘ একটা সময় কেবল বইটি দেখেছি। শুধুই দেখেছি। হাতে ছুঁয়ে দেখেছি এবং পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চর্মচোখে অবলোকন করেছি। অনুবাদকর্ম শুরু করার সাহস হয়নি তখনও...

অবশেষে দিনক্ষণ ঠিক করে ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আমার অনুবাদযাত্রা। ২০১৬ থেকে ২০২১— দীর্ঘ এ সময়কালটি বাংলা ভাষান্তরে যতটা ব্যয় হয়েছে; তার চেয়ে অধিকহারে সময় ব্যয় হয়েছে বইকেন্দ্রিক মুগ্ধতায় এবং চিন্তা-ভাবনায়। অনুবাদকর্মে সঙ্গী হিসেবে পাশে পেলাম আমার সহোদর বড়ভাই মো. আবুল বাশারকে। কারণ ইংরেজি ভাষার পাঠশালায় আমি একেবারেই 'তিফলে মকবত' আর দাদা ইংরেজি ভাষার দক্ষ ব্যক্তিত্ব। বইটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে মানসম্মত মোড়কে পাঠকের হাতে পৌঁছার নেপথ্যে ভাইয়ার অবদানের পাশাপাশি সৈয়দা আফসানা আফরোজ জুঁই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান মিলুর অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জুঁই এবং মিলুর হাতের ছোঁয়ায় অলঙ্কৃত হয়েছে বইটির সর্বশেষ ভাষান্তর প্রক্রিয়া।

১০০১ আবিষ্কার মানে বইটিতে হাতের কর গুণে গুণে ১০০১টি আবিষ্কারের গল্প সংকলিত হয়েছে— এমনটা নয়। আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য-অগণিত আবিষ্কারের নেপথ্যে মুসলিম সভ্যতার মহানায়ক মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানের আধিক্য বোঝাতে ১০০১ সংখ্যাটিকে একটি বিশেষণমূলক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। www.1001inventions.com মূলত ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে যারা কাজ করেন। ১০০১ আবিষ্কার শিরোনামে মুসলিম সভ্যতার মহানায়ক মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানকে খুঁজে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করাই মূলত ১০০১ আবিষ্কার টিমের মূল ব্রত। ১০০১ আবিষ্কার টিমের বিশ্বনন্দিত মহতী কিছু কাজকে দু মলাটে আবৃত করে বই আকারে প্রকাশ করেছে বিখ্যাত

ভেতরের পাতায়

প্রাককথন :

১. সুলতানস থেকে— ০৫

২. আমার ১০০১
আবিষ্কার যাত্রা— ০৭

৩. ভেতরের পাতায়— ০৯

৪. অবতরণিকা— ১৩

৫. লেখকের ভূমিকা— ১৪

৬. মুসলিম সভ্যতার প্রধান প্রধান
অবদানের মানচিত্র— ২০

প্রথম অধ্যায় :
গল্পের শুরু যেভাবে— ২৩

১. অন্ধকার যুগ
নাকি স্বর্ণযুগ— ২৪

২. মুসলিম সভ্যতা :
কখন এবং কোথায়?— ২৮

৩. মুসলিম সভ্যতার
উন্নয়নের সময়কাল— ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় :
বসতবাড়ি সম্পর্কিত আবিষ্কার— ৪১

১. কফি— ৪২

২. চমৎকার খাদ্যপণ্য ও
খাবারের বৈচিত্র্য— ৪৪

৩. তিন রকমের খাবার— ৪৭

৪. ঘড়ি— ৪৯

৫. দাবাখেলা— ৫৪

৬. সংগীত— ৫৬

৭. পরিচ্ছন্নতা সরঞ্জাম
ও সুগন্ধী— ৫৯

৮. ধাঁধাযন্ত্র— ৬২

৯. দূরদর্শন বা ক্যামেরা— ৬৪
হাইলাইটস : ক্যামেরা
অবস্কুরা— ৬৬

১০. ফ্যাশন এবং
লাইফস্টাইল— ৬৮

১১. কার্পেট-গালিচা— ৭০

তৃতীয় অধ্যায় :
বিদ্যালয় সম্পর্কিত আবিষ্কার— ৭৩

১. বিদ্যালয়— ৭৪

২. বিশ্ববিদ্যালয়— ৭৮

৩. হাউজ অব উইজডম— ৮৩
হাইলাইটস : একটি বুদ্ধিবৃত্তিক
পাওয়ারহাউজ— ৮৬

৪. গ্রন্থাগার ও বইয়ের
দোকান— ৮৮

৫. জ্ঞানের অনুবাদ— ৯৩

৬. গণিত— ৯৭

৭. ত্রিকোণমিতি— ১০১

৮. রসায়ন—১০৩
হাইলাইটস : ডিসটিলেশন বা
পাতন— ১০৬

৯. বাণিজ্যিক রসায়ন— ১০৮

১০. জ্যামিতি— ১১০

১১. শিল্প ও নকশা— ১১৫

১২. লিপিকার— ১১৭

১৩. শব্দের শক্তি— ১২১

চতুর্থ অধ্যায় :
বাজার সম্পর্কিত আবিষ্কার

১. কৃষি বিপ্লব— ১২৬
২. কৃষি কাজের সরঞ্জাম-নির্দেশিকা— ১৩১
৩. পানি ব্যবস্থাপনা— ১৩৫
৪. পানি সরবরাহ— ১৩৭
হাইলাইটস : দ্য রিসিপ্রোকেশন পাম্প— ১৪২
৫. বাঁধ— ১৪৪
৬. বায়ুকল— ১৪৬
হাইলাইটস : বায়ুশক্তি — ১৪৮
৭. ব্যবসা-বাণিজ্য— ১৫০
৮. বস্ত্র/টেক্সটাইল— ১৫৩
৯. কাগজ— ১৫৮
১০. মৃৎশিল্প— ১৬০
১১. কাচের শিল্প-কারখানা— ১৬৫
১২. মণিমুক্তা, খনিজসম্পদ ও অলংকার— ১৬৭
১৩. মুদ্রা— ১৬৯

পঞ্চম অধ্যায় :
হাসপাতাল সম্পর্কিত আবিষ্কার

১. হাসপাতালের উন্নয়ন— ১৭৬
২. নিখুঁত যন্ত্রপাতি— ১৮১
হাইলাইটস : অস্ত্রোপচারে নির্ভুলতা— ১৮৪
৩. শল্যচিকিৎসা বা সার্জারি— ১৮৬
৪. রক্ত সঞ্চালন— ১৯০
৫. ইবনে সিনার হাড় ভাঙা চিকিৎসা— ১৯৩
হাইলাইটস : ঔষধের রচনাসমগ্র— ১৯৬
৬. চক্ষু বিশেষজ্ঞের নোটবুক— ১৯৮
৭. টিকা— ২০২
৮. ভেষজ ঔষধ— ২০৪
৯. ঔষধালয়— ২০৯
১০. স্বাস্থ্যবিদ্যা— ২১২

ষষ্ঠ অধ্যায় :
নগর সম্পর্কিত আবিষ্কার

১. নগর পরিকল্পনা— ২১৬
হাইলাইটস : সুন্দরজীবন— ২১৮
২. স্থাপত্য— ২২০
৩. খিলান— ২২২
৪. ভল্ট বা ধনুকাকৃতির ছাদ ও খিলান— ২২৭
৫. গম্বুজ— ২৩১
হাইলাইটস : সুলেমানিয়া মসজিদ— ২৩৪
৬. মিনার— ২৩৬
৭. প্রভাববিস্তারকারী আইডিয়া— ২৩৮
৮. দুর্গ এবং তার তত্ত্বাবধান— ২৪০
৯. গণগোসলখানা— ২৪২
১০. তাঁবু— ২৪৬
১১. কাচঘর— ২৪৮
১২. বাগান— ২৫১
১৩. ঝরনা— ২৫৪

সপ্তম অধ্যায় :
পৃথিবী সম্পর্কিত আবিষ্কার
১. পৃথিবী গ্রহ— ২৫৮
২. পৃথিবী বিজ্ঞান— ২৬০
৩. প্রাকৃতিক ঘটনা
ও জ্ঞান— ২৬৩
৪. ভূগোল— ২৬৫
হাইলাইটস : আল-ইদ্রিসির
মানচিত্র— ২৭০
৫. মানচিত্র— ২৭২
হাইলাইটস : পিরি রেইসের
মানচিত্র— ২৭৬
৬. পর্যটক ও অভিযাত্রীদল— ২৭৮
৭. নৌচালনবিদ্যা— ২৮৫
৮. নৌ-অনুসন্ধান— ২৮৭
৯. বৈশ্বিক যোগাযোগ— ২৯২
১০. যুদ্ধ ও অস্ত্রশস্ত্র— ২৯৪
১১. সমাজিক বিজ্ঞান
ও অর্থনীতি— ২৯৬

অষ্টম অধ্যায় :
মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আবিষ্কার
১. জ্যোতির্বিদ্যা— ৩০০
২. মানমন্দির— ৩০৫
হাইলাইটস : তাকি আল-দ্বীনের
মানমন্দির— ৩১০
৩. জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত
যন্ত্রপাতি— ৩১২
৪. অ্যাস্ট্রোলেব— ৩১৬
হাইলাইটস : জাদুকরী যন্ত্র— ৩২০
৫. আর্মিলারি স্ফেয়ার— ৩২২
৬. জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিদর্শন— ৩২৪
৭. চাঁদ— ৩২৬
৮. চাঁদের কলঙ্ক— ৩২৮
৯. নক্ষত্রপুঞ্জ— ৩৩১
১০. উড্ডয়ন— ৩৩৩

রেফারেন্স :
জ্ঞান-সম্পদ
১. পাণ্ডিত্যের হাজার
বছর— ৩৪২
২. লেখক ও
গ্রন্থসমূহ— ৩৫০
৩. পরিভাষাকোষ— ৩৭১

CLARENCE HOUSE

অবতরণিকা

১৯৯৩ সালে আমি 'ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্ব' বিষয়ের ওপর অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্ট্যাডিজে একটি বক্তব্য দিয়েছিলাম। সেখানে আমি দুটি বিশ্বের মধ্যকার বিপজ্জনক ভুল বোঝাবুঝির কথা বলেছিলাম। আমি উপস্থাপন করেছিলাম— এই দুটি বিশ্বের মধ্যে বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীর একটি সম্পর্ক রয়েছে— যার মাধ্যমে আমরা দুটি আলাদা সংস্কৃতির মানুষও একত্র হয়ে যেতে পারি।

বর্তমানে— যখন এই সম্পর্ক পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি গুরুত্ব বহন করতে সক্ষম ঠিক এমন একটি ক্ষণে '১০০১ আবিষ্কার'-এর মতো উদ্যোগের সাফল্য দেখে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত। এ উদ্যোগটি আমাদের সামনে ইসলামিক বিশ্বের এবং পশ্চিমা বিশ্বের বহু বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং মানবিক উন্নয়নমূলক আবিষ্কারগুলোকে খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। ইতিহাসের পাতায়, সপ্তম শতকের সময়টাকে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়ে থাকে। সে সময়টাতে পশ্চিমা বিশ্ব যখন সংগ্রাম করছিল; মুসলিম বিশ্ব সব দিক দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল— বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বীজগণিত, আইনবিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসা, ঔষধি জ্ঞান, আলোকবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব এবং সংগীতে বিশেষ অবদান রেখেছিল সে সময়ের মুসলিম বিশ্ব। সময়টা ছিল মুসলিম সভ্যতার আবিষ্কারের 'স্বর্ণযুগ'— যা ইউরোপীয় রেনেসাঁয় তৎকালীন বিশাল অবদান রেখেছিল। এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়— '১০০১ আবিষ্কার' হচ্ছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি দলের নিজস্ব উদ্যোগ; যাদের সহযোগিতা করছে বিশ্বের বহু জ্ঞানী এবং বিখ্যাত ইতিহাসবিদ। '১০০১ আবিষ্কার' বইটি, প্রদর্শনী এবং ফিল্মগুলো সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের শেকড় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

বইটির বর্তমান অর্থাৎ তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি থেকে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের সেই 'স্বর্ণযুগের' মনোমুগ্ধকর ইতিহাসের কথাগুলো উপস্থাপিত হয়েছে আরও জোরালোভাবে। এ প্রকাশনাটি আমাদের বুঝতে শেখাবে— তৎকালীন মুসলিম সভ্যতার নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন জাতি-গোত্র এবং ধর্মের নারী-পুরুষ একত্রে এমন কিছু কাজ সৃষ্টি করতে পেরেছে; আমাদের বর্তমান আধুনিক যুগের দৈনন্দিন জীবনযাপনেও গভীরভাবে অবদান রাখছে যা।

আমি আশা করি '১০০১ আবিষ্কার'-এর চিন্তাধারা এবং বিশেষ করে এই বইটি ভবিষ্যতের সকল বিজ্ঞানী, স্কলার, পুরুষ-নারী, মুসলিম-অমুসলিমদের একটি উন্নত বিশ্ব তৈরির নেপথ্যে অনুপ্রাণিত করবে। আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য এবং সম্প্রসারণ কামনা করছি।

মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলস

মুসলিম সভ্যতার প্রধান প্রধান অবদানের মানচিত্র

মুসলিম বিশ্ব প্রধানত তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। এক— স্পেনের টলেডো থেকে আরব দেশ। দুই— ইন্দোনেশিয়া হয়ে চীন পর্যন্ত এবং তিন— পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত। মুসলিম সভ্যতা মূলত তার চরম শিখরে পৌঁছেছে ১২ শতাব্দীতে। সময়টা ছিল— আব্বাসীয় আমল। মধ্যপ্রাচ্য ও স্পেনের নগরীগুলো সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বাণিজ্যের বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মুসলিমদের সহনশীলতা ও সৃজনশীলতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কৃষিতে যুক্ত হয়েছিল যুগান্তকারী সব উন্নয়ন। নিচের মানচিত্রটি লক্ষ্য করলে সেসময় কোথায় কীভাবে কী ঘটেছিল— তা বোধগম্য হবে।

বিশ্বমানচিত্র : আল-ইদ্রিসি (১০৯৯-১১৬৬)
আল-ইদ্রিসি সিসিলির নর্মান রাজা দ্বিতীয় রজার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন একটি মানচিত্র আঁকার জন্য। তিনি ৭০টি মানচিত্র বিশিষ্ট একটি অ্যাটলাস তৈরি করেছিলেন, যার নাম ছিল— 'বুক অব রজার'। এটিতে তিনি দেখিয়েছিলেন— পৃথিবী গোলাকৃতির। অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতেরই এমনটা ধারণা ছিল।

বিশালাকৃতির ধনুকসদৃশ ছাদ : (১০০০)
টলেডো ও কর্ডোভার মসজিদসমূহের বিশালাকৃতির ধনুকসদৃশ ছাদগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যশিল্পীদের রোমান স্থাপত্যশিল্পে ও গথিক (একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী) মুভমেন্টে ছাদগুলো থেকে ধারণা লাভ করতে উৎসাহিত করেছিল।

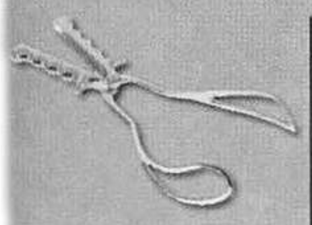

অস্ত্রোপচার সহায়ক যন্ত্রপাতি : আল-জাহরাবি (৯৩৬-১০১৩)
বিখ্যাত সার্জন আল-জাহরাবি ২০০টিরও বেশি অস্ত্রোপচারের যন্ত্রের সাথে পৃথিবীকে পরিচয় করিয়ে দেন; যেগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব সৃষ্টি করে। এই যন্ত্রগুলো বর্তমান সময়ের ২১ শতাব্দীর হাসপাতালগুলোতেও উপেক্ষা করার মতো নয়।

অনুসন্ধান : ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮/৭০)
ইবনে বতুতা ২৯ বছরে ৪০টি দেশের ৭৫০০০ মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করেছেন। এসব ভ্রমণে স্বচক্ষে দেখা মধ্যযুগীয় বিশ্বের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির একটি সংকলনও তৈরি করেছিলেন তিনি।

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ভিত্তি : ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার উত্থান-পতন চিহ্নিত করেছিলেন ইবনে খালদুন। তার অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে সংকলিত পুরো বিষয়গুলো তিনি তার রচিত বিখ্যাত 'আল-মুকাদ্দিমাহ' অথবা 'ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যা হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তার এসব সংকলনই সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির থিওরিগুলোর মৌলিক ভিত্তি।

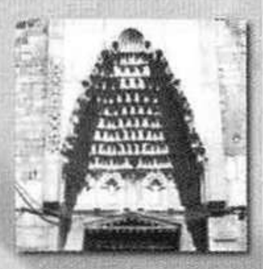

ঘোড়ার খুরাকৃতি তোরণ : (৭১৫)
নলের মতো দেখতে এই তোরণ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় দামেস্কের বিখ্যাত উমায়াদ মসজিদে। ব্রিটেনে এটি 'মুরিশ তোরণ' নামে পরিচিত এবং এটি রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আল-নুরি হাসপাতাল : (১১৫৬)
আল-নুরি হাসপাতালটিতে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হতো। আল-নুরি ছিল বিশাল ও বেশ কঠিন হাসপাতাল— সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেখানে সমস্ত ঔষধ বিক্রেতা, নাপিত, অস্থিবিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং বাকি সকল ডাক্তারকে বাজার পরিদর্শকরা (মার্কেট রিসার্চারগণ) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়োগ দিতেন।

রক্ত সঞ্চালন : ইবনে আল-নাফিস (১২১০-১২৮৮)
মিশরের ইবনে আল-নাফিসই সর্বপ্রথম শিরাস্থ রক্তের ফুসফুসজনিত সঞ্চালনের বিষয়ে বর্ণনা করেন। তিনি প্রথম শনাক্ত করেন এটি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে। উক্ত উদ্ভাবনের জন্য ইবনে আল-নাফিস অবশেষে ১৯৫৭ সালে স্বীকৃতি পান।

নকশাখচিত তোরণ : (নবম শতাব্দী)
নকশাখচিত তোরণ— যা গথিক স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে নির্মিত। এটি ইউরোপে এসেছে কায়রোর মনোরম ইবনে তুলুন মসজিদ থেকে। নকশাখচিত এ তোরণ ইউরোপীয় স্থপতিদের রোমানীয় স্থাপত্যের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম করেছিল।

ক্যামেরা অবস্কুরা : ইবনে হাইথাম (৯৬৫-১০৩৯)
একটি অন্ধকার কক্ষে ইবনে হাইথাম পরীক্ষা করেছিলেন— কক্ষটিতে কোনো সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে আলো প্রবেশ করলে কক্ষটির বিপরীত দিকের দেয়ালে কেমন আলো বা ছবিছায়া তৈরি হয়। তার এই পিনহোল ক্যামেরাই আজকের আধুনিক ক্যামেরার গোড়াপত্তন করে।

দুর্গ : (১২ শতাব্দী)
সিরিয়া ও জেরুজালেমে নির্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গের ডিজাইন পরবর্তীকালে পশ্চিমা বিশ্বে নকল করা হয়।

পানি উত্তোলক মেশিন : আল-জাজারি (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুভাগ)
আল-জাজারির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো পৃষ্ঠা বাঁক ও সংযোগকারী রড সিস্টেমের প্রয়োগ— যা ঘূর্ণায়মান গতিকে রৈখিক গতিতে পরিণত করত। তার তৈরি মেশিনটি মানুষের কোনো সহায়তা ছাড়াই একত্রে প্রচুর পানি উত্তোলন করতে পারত।

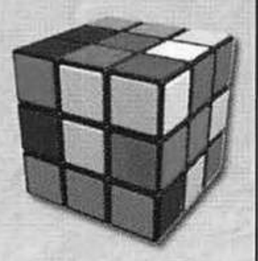

রসায়ন : (৭২২-৮১৫)
এই সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান যুগের রসায়নের ভিত্তি। জাবির ইবনে হাইয়ান এ সময়ে সালফিউরিক নাইট্রিক, নিটরো-মিউরেটিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ এসিড আবিষ্কার করেন। এ সময়েই আল-রাজি ধাতু ও স্টিলের মতো প্রায় বিশটিরও অধিক উপাদান ব্যবহার করে একটি আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন।

কৌশলযন্ত্র : (নবম শতাব্দী)
বনু মুসা ব্রাদার্স তথা তিন ভাই— এরা ছিল বিখ্যাত গণিতবিদ। গ্রিসের বহু বৈজ্ঞানিক পুস্তক-পুস্তিকা অনুবাদ করেছিলেন তারা। চমকপ্রদ সব কৌশলযন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যেগুলোকে ট্রিক ডিভাইসের (যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গোয়েন্দাগিরি করা হয় এবং নিরাপত্তাযন্ত্র) পথিকৃৎ আবিষ্কার মনে করা হয়।

হাউজ অব উইজডম : (৮১৪ শতাব্দী)
এ বিশাল বৈজ্ঞানিক একাডেমিটি ছিল চার খলিফাদের চার প্রজন্মের আবিষ্কারের ফল। হাউজ অব উইজডমের মাধ্যমেই মুসলিম পণ্ডিতদের বহু আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটে। এটা ছিল বিজ্ঞান ও মানবিক অধ্যয়নের অনন্য এক কেন্দ্র; যেখানে বৈশ্বিক বহু জ্ঞানের সৃষ্টি ও উন্নয়ন করা হয়েছিল।

তথ্যগুপ্তিকরণ বিদ্যা : আল-কিন্দি (৮০১-৮৭৩)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মীমাংসাকারীরা প্রথমে কোডিংয়ের অনুসরণ করতে শুরু করে। এর ভিত্তি রচিত হয় বাগদাদের আল-কিন্দির মাধ্যমে। সেসময় তিনি ফ্রিকুয়েন্সির ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির সূচনা করেন।

পাতনপ্রক্রিয়া : জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২-৮১৫)
জাবির ইবনে হাইয়ানই প্রথমে পাতনিক স্থাণু ব্যবহার করে পতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেন। তার সে ধারণা বর্তমানেও ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বই গোলাপ জল, গুরুত্বপূর্ণ তৈল এবং চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় খাঁটি অ্যালকোহল তৈরি করেন। বর্তমানে পাতনযন্ত্রই আমাদের প্লাস্টিক থেকে পেট্রল— সব ধরনের পণ্য দিচ্ছে।

খোয়ারিজম
কাবুল
বাগদাদ
কুফা
দীল্লি
পাটনা
ক্যান্টন
মোচা

অ্যালজেবরা : আল-খাওয়ারিজমি (৭৮০-৮৫০)
আল-খাওয়ারিজমিই প্রথমে অ্যালজেবরা বা বীজগণিতের ধারণা দেন। পরবর্তীকালে সেটাকে আরও উন্নত করা হয়; যা আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

শ্যাম্পু : শাইখ দ্বীন মুহাম্মাদ (অষ্টাদশ শতাব্দী)
ব্রিটেনের ব্রাইটনে সর্বপ্রথম ইন্ডিয়ার পাটনা থেকে আগত শাইখ দ্বীন মুহাম্মদের মাধ্যমে শ্যাম্পুর ধারণা পাওয়া যায়। চতুর্থ জর্জও চতুর্থ উইলিয়াস চতুর্থের কাছে 'শ্যাম্পু সার্জন' নামে শাইখ দ্বীন মুহাম্মাদ পরিচিত লাভ করেন।

কফি : (অষ্টম শতাব্দী)
ছাগল ও অন্যান্য পশুপালক খালিদ লক্ষ্য করলেন— তার পালিত পশুগুলো একধরনের লাল বিশেষ জাম ফল খাচ্ছে এবং খুব উত্তেজিত হচ্ছে। এটা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি পরবর্তীকালে এর মাধ্যমে 'আল-কাওয়া' পানীয় উৎপাদন করেন। এটিই বর্তমানের কফি। পানীয়টি ১৫০০ শতাব্দীর দিকে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রচলন লাভ করে এবং পরবর্তীকালে ১৬৩৭ সালের দিকে ইউরোপে প্রচলন লাভ করে।

*** সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বহুবার মুসলিম সভ্যতা কর্তৃক প্রচুর জমি আবাদ হয়।**

NATIONAL GEOGRAPHIC

1001 inventions

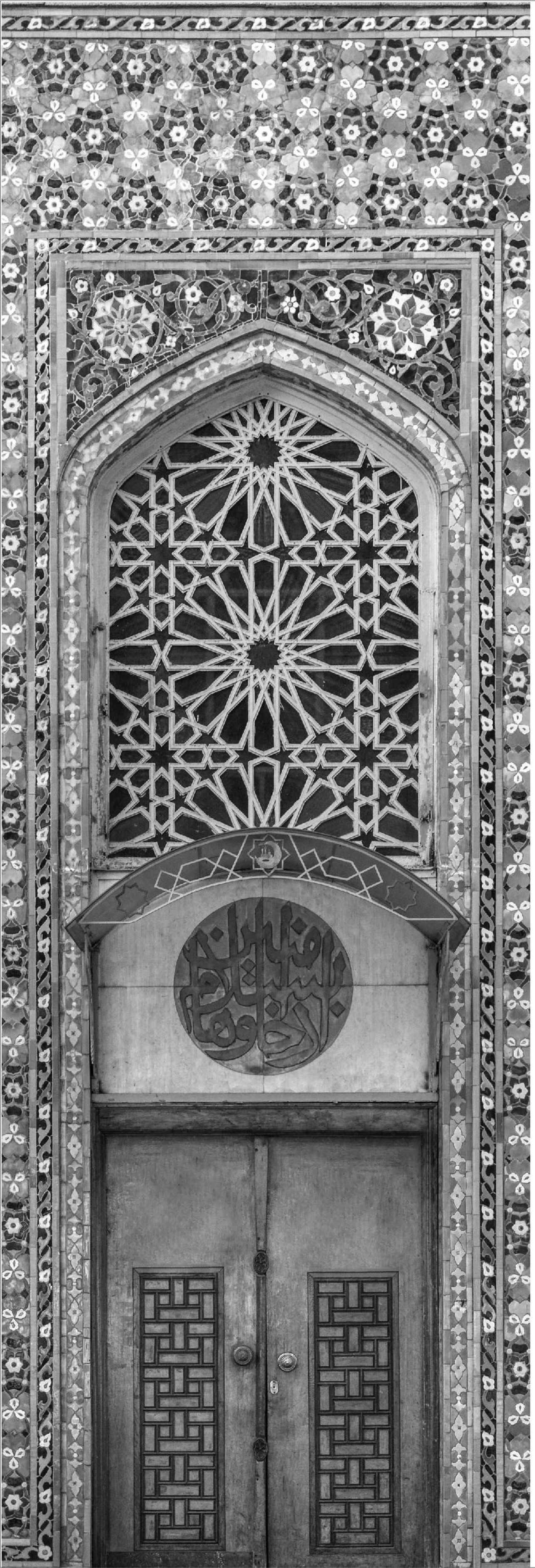

মুসলিম সভ্যতা কখন এবং কোথায়?

৬৩২ মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরবর্তীকালে যেসব খলিফা আসীন হয়েছিলেন— তারা এমন একটি সাম্রাজ্য তৈরি করেছিলেন; যা দক্ষিণ স্পেন থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত এবং চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ১৫ শতাব্দীর দিকে এটি ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এসময় তারা জ্ঞান বিস্তার এবং সম্পদের এক অপার সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাদের অবদানের আলোকেই সেসময়ে বাণিজ্যের সাথে জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রসার ঘটে। পণ্ডিতরা ব্রহ্মগুপ্ত, এরিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমি এবং হিপোক্রেটিসের মতো প্রাচীন চিন্তাবিদদের লেখা প্রবন্ধগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন— যা সেসময়ের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বীজগণিত, আইনবিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ঔষধি জ্ঞান, আলোকবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, প্রকৌশলবিদ্যা এবং সংগীতে উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সে সময়কালটি ছিল— চিন্তাধারা, উন্নয়ন এবং জ্ঞান ও ধনসম্পদ আহরণের এক স্বর্ণযুগ।

কীভাবে এমন একটি সভ্যতার পতন হলো? এটি এমন একটি প্রশ্ন— যার উত্তর বহু মানুষই খোঁজার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়টি এতটা গভীর— মাত্র একটি বইয়ে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে ১৫ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্পেন, তুরস্ক ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের হামলা; পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ায় মঙ্গলদের আক্রমণের কারণে মুসলিম সভ্যতা হুমকির মুখে পতিত হয়েছিল। এই সংঘাতের সময়ে মুসলিম বিশ্বের বহু প্রাচীন-বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও শিক্ষণসামগ্রীর বিপর্যয় ঘটেছিল। ১২৫৮ সালে যখন বাগদাদ আক্রমণ করা হয়েছিল তখন আক্রমণকারী মঙ্গল সেনাবাহিনী অগণিত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করেছিল এবং কর্ডোভা নগরীর বিস্তৃত ছয় লক্ষাধিক ইসলামিক বই ক্রুসেড

মুসলিম সভ্যতার উন্নয়নের সময়কাল
[৬৩২-১৭৯৬]

সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে হাজার বছরের বেশি সময়ের জন্য মুসলিম বিশ্ব দক্ষিণ স্পেন থেকে চীন ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে বিস্তৃত হয়। দিগ্‌বিদিক আলোকিত ছিল তাদের অবদানে। এ সময়ে পণ্ডিত নারী ও পুরুষ এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষরাও নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্ব গড়ার জন্য একসাথে কাজ করেছেন। তারা এমন এক যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন; যার ফলে জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির অবিশ্বাস্য বিস্তার ঘটেছে— যা ছিল মানব ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

নিচের সময়কালের দিকে তাকালেই মুসলিম সভ্যতায় অঙ্ক, বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা, গবেষণা, অন্বেষণ, শিক্ষা এবং ঔষধ শিল্পসহ বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়ন দেখতে পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে— কীভাবে এসব ধারণা ও জ্ঞান প্রাচ্যদেশ থেকে বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আরও জানা যাবে— তৎকালীন এসব অবদান রেনেসাঁর উন্নয়নের মাধ্যমে আরেকটি দুর্দান্ত যুগের পথও সুগম করেছিল।

৬৩৭
ইসলাম ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে পারস্য, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এবং পরে মিশরে।

সিএ ৬৩৫
আল-শিফাকে দ্বিতীয় খলিফা উমর প্রথমে মদিনা শহরে এবং তার পরে বাসরাহে প্রথম নারী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন।

৬৫৪
সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটে।

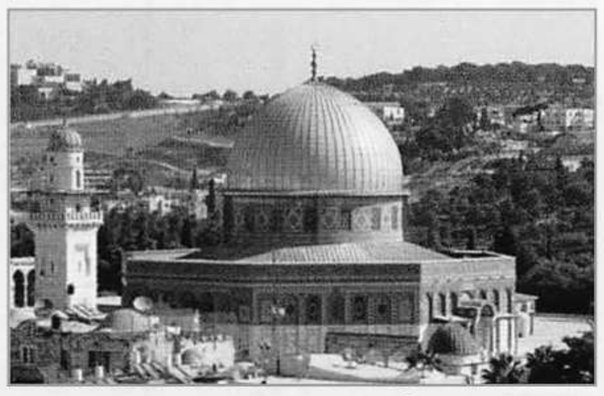
ডোম অব দ্য রক মসজিদ

৬৯১
ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে পাথরের তৈরি মসজিদের গম্বুজ নির্মাণকাজ শুরু হয়।

৬৩২
মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা বা মুসলিম শাসক হিসেবে হজরত আবু বকরের (রা.) শাসনকাল শুরু।

৬৪৪
পারস্যে উইন্ডমিলের সাহায্যে চালানো একটি জাঁতাকল স্থাপিত হয়।

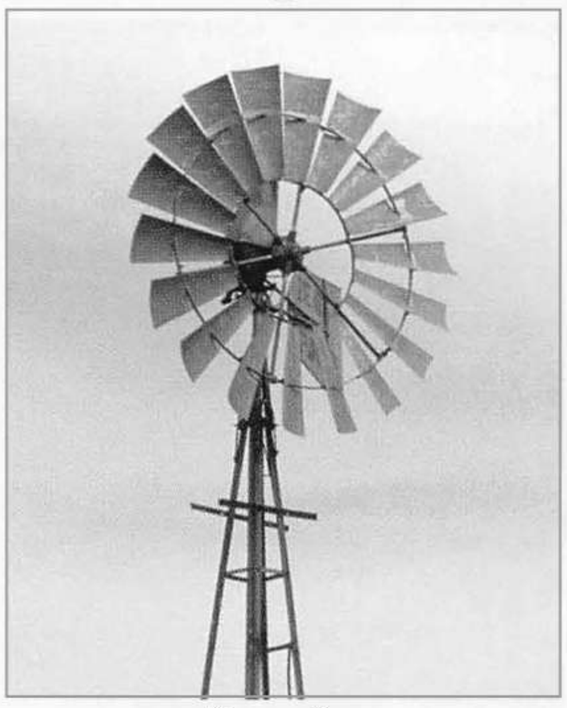
একটি মধ্যযুগীয় বায়ুকল

৬৬১
দামেস্ক থেকে উমাইয়া রাজবংশ কর্তৃক খেলাফতের শাসন শুরু হয়।

৭১১
স্পেনে ইসলামের বিস্তার ঘটে।

স্পেনের কর্ডোভার একটি পুরাতন রাস্তা

‘বই ছাড়া কোনোদিন শিক্ষা হতে পারে না।’
—আরবি প্রবাদ

■ মুসলিম ঘটনাবলি
■ ইউরোপিয়ান ঘটনাবলি

পাতন

সিএ ৭২২
রসায়নের জনক জাবির ইবনে হাইয়ানের জন্ম।

জোতির্বিজ্ঞান

সিএ ৭৭৭
অ্যাস্ট্রোলেব বা জোতির্বিজ্ঞান নির্মাতা জ্যোতির্বিদ আল-ফাজারির মৃত্যু।

সোনার মুদ্রা

৭৮৭
কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণকাজ শুরু হয়।

৭৮৬
খলিফা হারুন আর রশিদ কর্তৃক বাগদাদে 'দ্য হাউজ অব উইজডোম' স্থাপন।

৭৮৫
খলিফা আল-মনসুরের সোনার দিনার অনুকরণ করে রাজা অফা একটি সোনার মানকাস মুদ্রা তৈরি করেন।

৮১৩
খলিফা আল-মামুন দ্য হাউজ অব উইজডমের সম্প্রসারণ করেন, যেখান থেকে অনুবাদ আন্দোলন তীব্র হয়।

৭৫০
আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের পরাজিত করে এবং ৭৬২ সালে বাগদাদে নতুন রাজধানী গড়ে তোলে। স্পেন উমাইয়া পরিবারের বংশধরদের দ্বারা শাসিত হয়।

৭৭৫
৭৮০
গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমির জন্ম। তার লেখা বই আল-জেবর ওয়াল মুকাবেলা থেকেই আধুনিক অ্যালজেবরার সৃষ্টি হয়েছিল।

৮০০
৭৯৫
বাগদাদে প্রথম পেপার মিল স্থাপিত হয়েছিল।

৮০০
খলিফা হারুন আর রশিদ চার্লেমাগণদের সামনে এমন ঘড়ি উপস্থাপন করেন, যা ঘণ্টাধ্বনি দিত।

৮০১
আল-কিন্দির জন্ম। তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী, দার্শনিক, মনোবিদ, রসায়নবিদ এবং সংগীত বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব।

আল-কিন্দি

৮২৫
৮২৮
বাগদাদের কাছে আল-সামশিয়াহ পর্যবেক্ষণাগার উদ্বোধন করেছিলেন আবু মানসুর ।

'শিক্ষক যদি জ্ঞানপিপাসু হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কখনো অর্থের বিনিময়ে তোমাকে তার জ্ঞানভবনে প্রবেশ করিয়েই ক্ষান্ত হবেন না বরং উল্টো তিনি তোমার মানসিকতা এমনভাবে গড়বেন— যা দিয়ে তুমি নিজেই জ্ঞান আহরণে সক্ষম হতে পারবে।'
—খলিল জিবরান, তার রচিত 'দ্য প্রফেট' বইয়ে উল্লেখ করেছেন

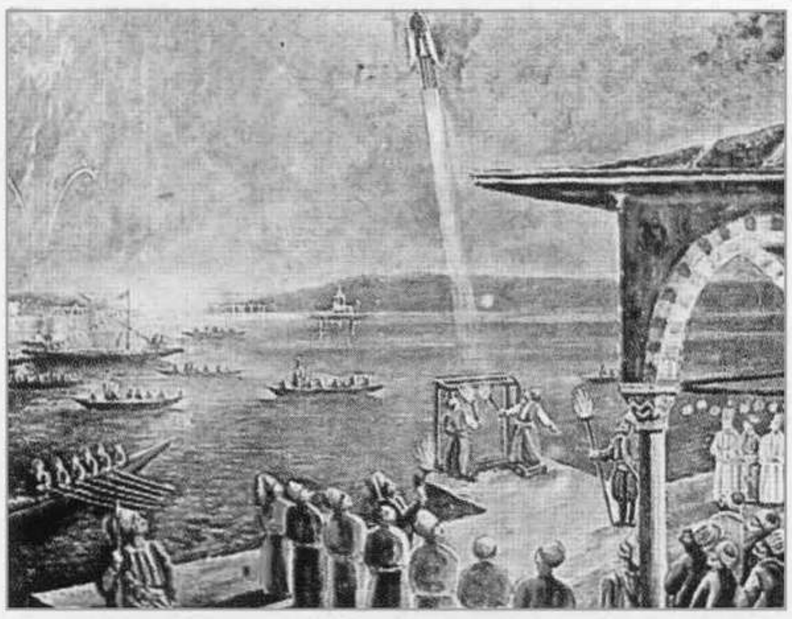

লাগরি হাসান সেলিবির রকেট বিমান

জেমস গিলার রচিত গ্রন্থ দ্য কাউ পক

১৬৩৩
লাগরি হাসান সেলেবি প্রথম মানব চালিত রকেটটিতে বসফরাস প্রণালীর উপর দিয়ে উড়েছিলেন।

১৬৩৪
রাজা প্রথম চার্লস লেভান্ট কোম্পানিকে অনুরোধ করেন যে, ইংল্যান্ডে ফিরে আসা প্রতিটি জাহাজে যেন আরবি পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসা হয়।

১৬৫৬
বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমুন্ড হ্যালির জন্ম। তিনি গ্রিক গণিতের আরবি সংস্করণ অনুবাদ করেছিলেন এবং আল-বাত্তানির পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর গবেষণা করেছিলেন।

১৬৬৪
হ্যাভেলিয়াসের অনুরোধে— রয়েল সোসাইটি উলুগ বেগের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাণ্ডুলিপিগুলো ফার্সি থেকে ল্যাটিন ভাষায় সম্পূর্ণরূপে অনুবাদ করতে সম্মত হয়।

১৬৮২
লন্ডনে মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মুহাম্মাদ ইবনে হাড্ডু লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সহকর্মী মনোনীত হয়েছিলেন।

১৭২৯
ইংল্যান্ডে নিযুক্ত ত্রিপলি রাষ্ট্রদূত কাসিম আগা উত্তর আফ্রিকার গুটিবসন্ত নির্মূলে ইনোকুলেশনের ব্যাপক অনুশীলন সম্পর্কে লিখেছিলেন এবং তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সহযোগী মনোনীত হয়েছিলেন।

১৭৯৬
অ্যাডওয়ার্ড জিনার জলবসন্তের টিকার পরীক্ষা করেন।

১৬৭৫ ১৭০০ ১৭২৫ ১৭৫০

১৬৪২
আইজ্যাক নিউটনের জন্ম। তিনি ইবনে আল-হাইথামের আলোকবিদ্যার ল্যাটিন অনুবাদ করা একটা বই তার লাইব্রেরিতে রাখেন।

১৬৫০
তুরস্কের ব্যবসায়ীরা ইংল্যান্ডে কফি নিয়ে আসেন।

লন্ডনে অ্যাডওয়ার্ড লয়েডসের কফি হাউজ

১৬৭৮
জন গ্রিভস লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেন—মিশরীয়রা কীভাবে একসাথে হাজার হাজার মুরগির ডিম উৎপাদনের জন্য বড় চুলা ব্যবহার করে থাকে।

১৭২১
লেডি মেরি মন্টাগো তুরস্কের চিকিৎসা পদ্ধতির রীতি ও চর্চার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ব্রিটেনে গুটিবসন্তের টিকার ওপর পরীক্ষা করেন।

১৭২৫
মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ বিন আলী আবগালি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সহযোগী মনোনীত হয়েছিলেন।

লেডি মেরি ওয়ার্টলি মন্টাগু

'যদি কেউ দক্ষ চিকিৎসক হতে চায়—
তাহলে তাকে অবশ্যই একজন
ইবনে সিনাবিদ হতে হবে।'
—ইউরোপের প্রাচীন প্রবাদ

ফোটানো হতো— যদিও এটি তখন ছাঁকা হতো না। ফলে কাপের নিচে কফির অবশিষ্টাংশ জমে থাকত। ১৬৮৩ সালে কফি প্রস্তুত করার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়। নতুন এ পদ্ধতি খুবই অল্প সময়ে কফিহাউজগুলোর কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ক্যাপুচিনো সন্ন্যাসীদের এক পুরোহিত মার্কো ডিআভিয়ানোর অনুপ্রেরণায় ক্যাপুচিনো কফি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সময়টা ১৬৮৩ সাল। মার্কো ডিআভিয়ানো তখন ভিয়েনা দখলকারী তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন। তুর্কিরা পরাজিত হয়ে ফিরে যাওয়ার পর, তাদের ফেলে যাওয়া কফির বস্তা থেকে প্রাপ্ত কফি ভিয়েনিজরা পান করত। সেই পরিত্যক্ত কফি প্রচুর কড়া হওয়াতে তারা তখন এই কফির সাথে ক্রিম এবং মধু মিশিয়ে পান করত। এতে করে কফিটির রং বাদামি হয়ে যেত; যা ক্যাপুচিনোদের পোশাকের রঙের প্রতিনিধিত্ব করত। ভিয়েনিজরা মার্কো ডিআভিয়ানোর সম্মানে এটির নাম রাখে 'ক্যাপুচিনো'। সেই থেকে ক্যাপুচিনোর উপভোগযোগ্যতা ও স্বাদ সবাইকে বুঁদ করে রেখেছে।

> “
> সাধারণ মানুষের স্বর্ণ— কফি। এটি সোনার মতো— প্রতিটি মানুষের মাঝে সুপ্ত বিলাসী অনুভূতি ও আভিজাত্যকে ফুটিয়ে তোলে।
> **—শেখ এবিডি আল-কাদির**
> **১৫৮৮ সালে প্রথম কফির ইতিহাসের গ্রন্থ লেখক**
> ”

কফিহাউজের উৎপত্তি

এ চিত্রে ১৭ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এডওয়ার্ড লয়েডের কফি হাউজকে চিত্রিত করা হয়েছে।

উত্তর আফ্রিকা এবং মিশর থেকে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইউরোপে কফি আসার পরে সর্বপ্রথম ১৬৪৫ সালে ভেনিসে কফিহাউজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭ শতাব্দীর শেষের দিকে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় এডওয়ার্ড লয়েডস কফিহাউজ এবং এটি ছিল বণিক ও জাহাজ মালিকদের সভা করার জায়গা। কফিহাউজগুলো ধীরে ধীরে আজকের পানশালায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই কফিহাউজগুলোতে মানুষ অন্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ করতে পারত এবং এখানে চলত মুক্তচিন্তার কথোপকথনও।

[৪.] চীনা ড্রাগন বলটিকে এর মুখে নিয়ে নেয় এবং ড্রাগনের মাথা নিচে নামতে থাকে, যা একটি পিভট (ক্ষুদ্রাকৃতির খুঁটি বিশেষ) নড়িয়ে দেয়। এতে করে আবার পানির ছোট পাত্রটি পানির উপরে উঠে যায়।

[৫.] অবশেষে বলটি নিচের তামার পাত্রে গিয়ে পড়লে হাতির ওপরে থাকা মানুষটি ঝাঁঝরি পাত্রটির সাথে ধাক্কা খায় এবং পাত্রটি বেঁকে যায়। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি আবার চালু হয়।

[৬.] ধীরে ধীরে ছোট পাত্রটি যত পানিতে ডুবে যেতে থাকে, এটি একটি দড়িতে টান দেয়। এতে করে একটি পুতুলের হাতে থাকা লাঠি নড়তে থাকে। এই লাঠিটি সঠিক মিনিট বলে দেয়।

[৭.] প্রতি আধা ঘণ্টায় ছোট পাত্রটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেই এই ঘড়ির উপরে থাকা একটি বল নড়তে শুরু করে এবং মিশরীয় ফিনিক্সের মতো একটি শব্দ করে।

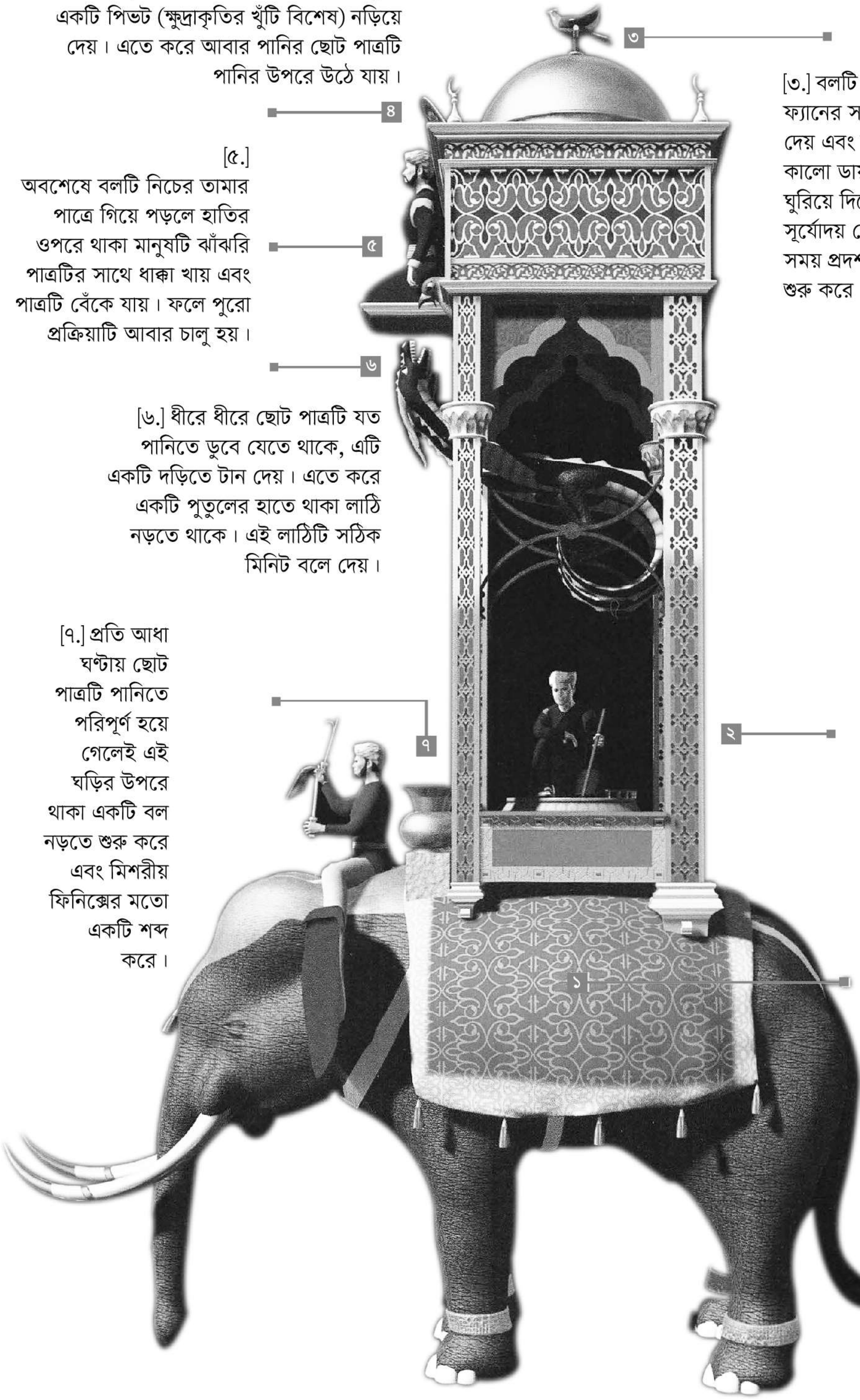

[৩.] বলটি একটি ফ্যানের সাথে ধাক্কা দেয় এবং রুপালি ও কালো ডায়ালকে ঘুরিয়ে দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সময় প্রদর্শন করা শুরু করে।

[২.] এরপর ঘড়ির পাশে ঝুলতে থাকা সুলতানটি পাশের দিকে ঝুঁকে যায় এবং বলটি নিচে পড়তে থাকে।

[১.] হাতির শরীরের মধ্যে একটি পানির পাত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই পাত্রের ওপর আরেকটি ছোট পাত্র রাখা হয়েছে। এই ছোট পাত্রের নিচেই ছোট একটি ছিদ্র রয়েছে।

০৮. ধাঁধাযন্ত্র

রুবিকস কিউব সমাধানের সময়ে আমরা অনেকেই হয়তো এই যন্ত্রটির ভেতরের বলের আওয়াজ শুনে থাকি। বিনোদন অথবা অবসর সময়ে যখনই আমরা খেলা অথবা ধাঁধার সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করি— সবসময়ই এগুলো আমাদের আকর্ষণ করেছে। এক সময় মানুষের নতুন বিনোদন ও আনন্দের অভাব ছিল। নবম শতাব্দীতে তা উপলব্ধি করতে পারেন তিন ভাই— মুহাম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির, আহমেদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির এবং আল-হাসান ইবনে মুসা ইবনে শাকির। যারা বনু মুসা ব্রাদার্স নামে বেশ পরিচিত ছিলেন। তারা বাগদাদের বিখ্যাত 'হাউজ অব উইজডম' এর সদস্য ছিলেন। অসাধারণ গণিতবিদ এবং অনুবাদক হওয়ার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন অসাধারণ ধাঁধার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এগুলোকে অনেকেই আধুনিককালের খেলনার মূল আবিষ্কার হিসেবে গণ্য করেন। মুসলিমদের আনন্দের জন্য বিভিন্ন ধাঁধাযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন তারা। দ্য বুক অব ইনজিনিয়াস ডিভাইসেস বইটিতে তাদের আবিষ্কৃত এরকম শতাধিক ধাঁধাযন্ত্রের বর্ণনা উল্লেখ ছিল। এই যন্ত্রগুলো থেকেই সেসময়ের যান্ত্রিক প্রযুক্তির সূত্রপাত ঘটে। আজকালকার খেলনার মতো এগুলোরও খুব সামান্য কার্যকারিতা ছিল ঠিকই, তবে ১১০০ বছর পুরনো এই যন্ত্রগুলো অসাধারণ জ্ঞান এবং কারিগরি দক্ষতার পরিচয় বহন করে। এই যন্ত্রগুলোর অধিকাংশতেই পানি, মেকি প্রাণী এবং কৃত্রিম শব্দ ব্যবহার করা হতো। তারা এমন একটি যান্ত্রিক গরু বানিয়েছিল, যা নিজ থেকে পানি খেত এবং পিপাসা নিবারণের সময় একটি ডাক দিত। যন্ত্রটি বানানো হয়েছিল বেশকিছু খালি চেম্বার, ভাসমান পাত্র, ভ্যাকুম এবং প্লাগ দ্বারা।

বনু মুসা ভাইদের এই যন্ত্রটির কার্যপ্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো— প্রথমে পানির কল থেকে কম্পার্টমেন্ট 'এ' তে পানি ভরে ফেলা হয় এবং কলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর পাত্রটিতেও পানি ভরা হয়। 'এম' চিহ্নিত একটি ভাসমান পাত্র ধীরে ধীরে পানির স্তরের সাথে বাড়তে থাকে এবং কপাটকের প্লাগটি খুলে দেয়। এতে কম্পার্টমেন্ট 'এ' থেকে কম্পার্টমেন্ট 'বি'-তে পানি চলে যায়। কম্পার্টমেন্ট 'বি'-তে থাকা একটি ভাসমান পাত্র ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে এবং 'বি' প্লাগটিকে চালু করে দেয়। এতে করে কম্পার্টমেন্ট 'বি'-তে থাকা সকল বাতাস বেরিয়ে যায় এবং কম্পার্টমেন্ট 'এ'-তে একটি বাতাসশূন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যতক্ষণে এই পাত্র থেকে সব পানি বেরিয়ে যায়, ততক্ষণে এই কম্পার্টমেন্টে বাতাস ঢুকে পড়ে এবং একটি শব্দ হয়। এই শব্দটি

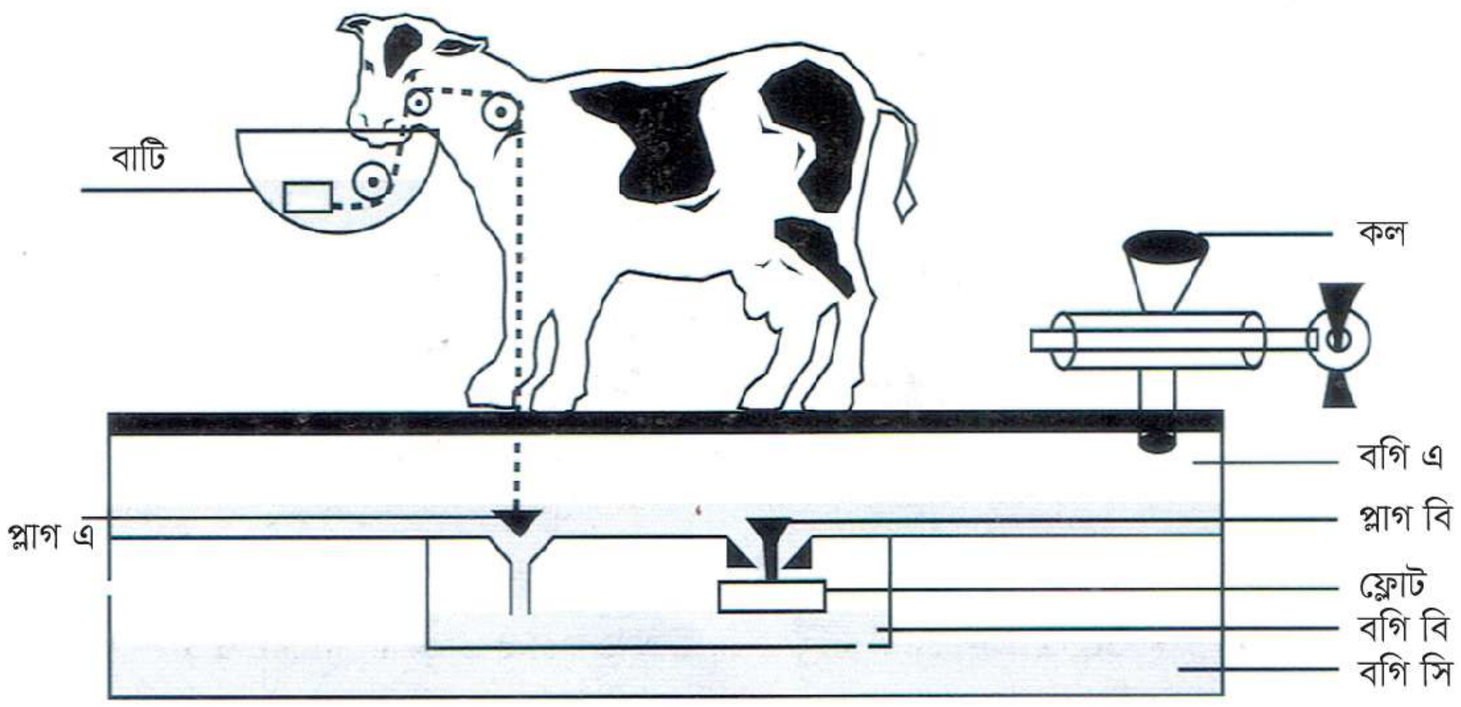

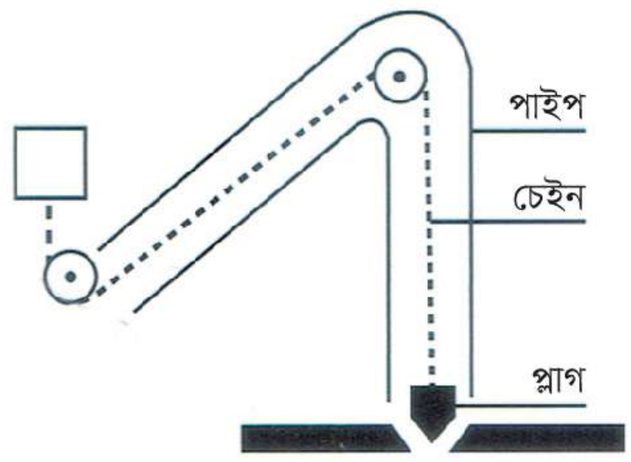

চিত্রটিতে বনু মুসা ভাইদের নবম শতাব্দীর 'ড্রিংকিং বুল' রোবট প্রদর্শন করা হয়েছে।

০৪. গ্রন্থাগার ও বইয়ের দোকান

কথিত আছে, আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন সকল পণ্ডিতকে প্রাচীন বইসমূহ গ্রিক ভাষা থেকে আরবিতে অনুবাদ করার জন্য পুরস্কার হিসেবে বইয়ের ভারের সমতুল্য স্বর্ণ প্রদান করতেন। এতে করে বহু বই অনুবাদ করা হয়েছিল— মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পরবর্তী প্রজন্মকে মনোযোগ ও সম্মান ধরে রাখার নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে শত শত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল; যার মধ্যে বেশকিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। এইসব গ্রন্থাগারে অসংখ্য বই পাওয়া যেত— প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারই শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো গ্রন্থের প্রকাশ ঘটার পূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে মুসলিম সভ্যতায় প্রথম বইয়ের প্রকাশ ঘটে আর সেটি ছিল— পবিত্র কুরআন। মহনবী হজরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর নাজিল হয়েছিল এই আসামনি কিতাব। এতে ছিল বহু আয়াত বা শ্লোক— যা মুহাম্মাদ (সা.)-এর শিষ্যরা বা সাহাবিরা মুখস্থ করে রেখেছিলেন এবং তা আশেপাশের যেকোনো বস্তুতে (গাছের পাতা, কাপড়, হাড় কিংবা পাথর) লিখে রেখেছিলেন। এই গ্রন্থটির প্রথম কপি সংরক্ষিত ছিল দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের (রা.) মেয়ে হাফসার কাছে। পুরো কুরআনের আয়াতগুলো সূরা হিসেবে ভাগ করা ছিল এবং প্রতিটি সূরা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই ব্যক্তিগতভাবে পড়ে দেখেছিলেন অর্থাৎ এ কপিটির সব আয়াত ও সুরা খোদ মহা নবী মুহাম্মাদ (সা.) পরীক্ষা করে দেখেছিলেন এবং সংশোধন করেছিলেন। এরপর এই মহাগ্রন্থটির বেশকিছু কপি তৈরি করা হয়েছিল, তবে সেগুলোর অধিকাংশতেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা সংযুক্ত ছিল।

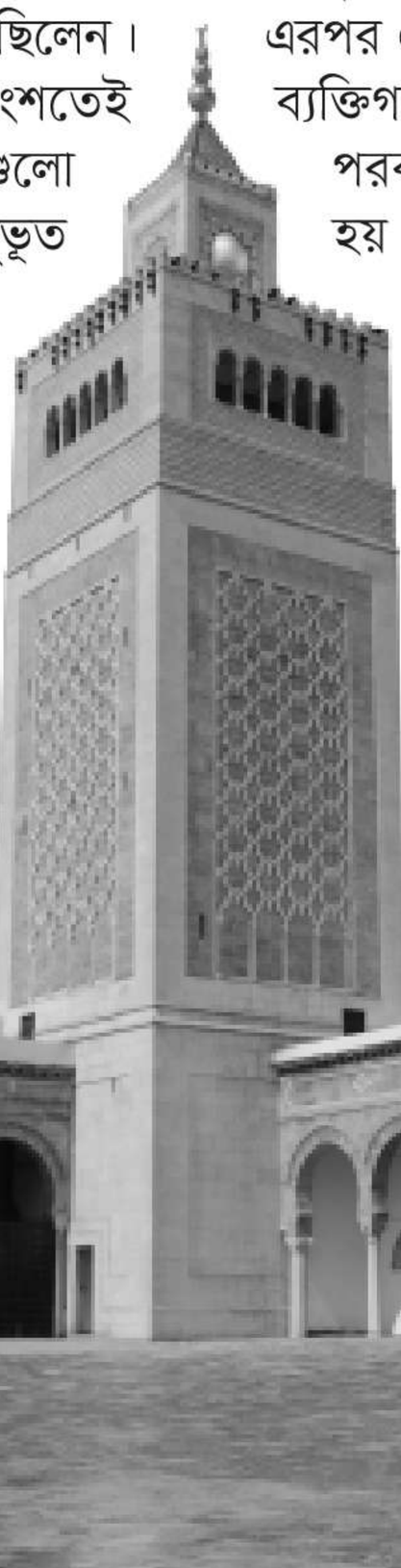

পবিত্র কুরআনের কপিগুলো পরবর্তীকালে একত্রিত করে একটি আদর্শ সংখ্যা প্রস্তুতের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাগুলো কেটে হাফসার সংগ্রহে থাকা কুরআনের কপির সঙ্গে এটি মেলাতে হয়েছিল। এভাবে পরিমার্জিত কুরআনটি তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান (রা.) নিজেই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। ফলে কুরআন পড়া ও লেখার জন্য একটি মানদণ্ড তৈরি হয়। এতে করে কুরআন চারদিকে আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৪০০ বছরের পুরনো এই উসমান পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন কপি এখনো বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান গ্রন্থাগারসমূহে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের কুরআন হচ্ছে এই প্রাচীন কুরআনের সত্যায়িত কপি।

তিউনিসিয়ার তিউনিসের জায়তুনা মসজিদ কলেজ ভবনটি তৈরি করা হয়েছিল ৭৩২ সালে। ১৩ শতকে এসে এই শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগারে প্রায় এক লক্ষ বইয়ের সংগ্রহ গড়ে ওঠে।

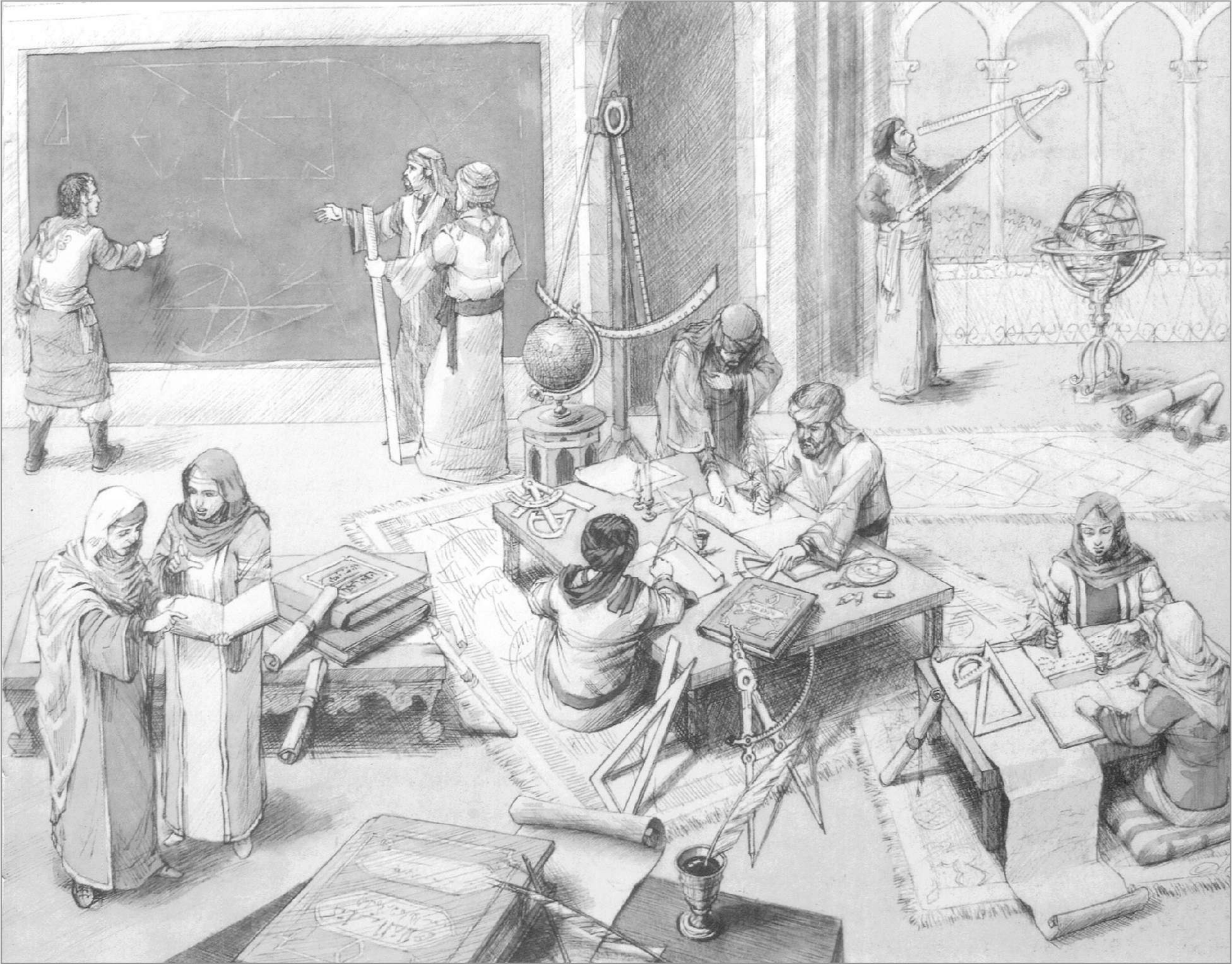

হাজার বছর আগে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবেগ হিসাব, অজানা কোণ ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার সময় মুসলিম পণ্ডিতেরা ত্রিকোণমিতিবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিলেন। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান, মানচিত্রনির্মাণবিদ্যা, নাবিকবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিকোণমিতি ও বৃত্তীয় ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করা হয়।

যেতে আহ্বান করেছিলেন। তার মতো আবু ওয়াফা, ইবনে ইউনুস এবং ইবনে আল-হাইথামও বৃত্তীয় ত্রিকোণমিতি নিয়ে কাজ করেছেন এবং এগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। আল-বাত্তানি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সাইন আর কো-সাইন ব্যবহার করেছিলেন। এগুলোকে তিনি দৈর্ঘ্য হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ট্যানজেন্টকে আল-বাত্তানি দেয়ালে বসানো একটি ধারণাগত আনুভূমিক রডের ছায়া বা 'বর্ধিত ছায়া' বলে উল্লেখ করেছেন। ১১ শতাব্দীতে আল-বিরুনি ট্যান এবং কটের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এই ট্যান ও কটের পরীক্ষামূলক ধারণা ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়।

আল-বিরুনি ৯৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ত্রিকোণমিতির জন্য যারা একটি ভিত গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আল-বিরুনি ছিলেন অন্যতম। ৭৮০ সালে জন্ম নেওয়া আল-খাওয়ারিজমি সাইন এবং কো-সাইন ও ত্রিকোণমিতিক টেবিল আবিষ্কার করেছিলেন—পরবর্তীকালে তা পশ্চিমা বিশ্বে ব্যবহার করা হয়েছে। এর আরও ৫০০ বছর পরে আধুনিক গণিতবিদদের দ্বারা ট্যানের ত্রিকোণমিতি আবিষ্কৃত হয়। তারও ১০০ বছর পরে নিকোলাস কোপার্নিকাস এ সম্পর্কে জানতে পারেন।

০৫. ইবনে সিনার হাড় ভাঙা চিকিৎসা

ইবনে সিনা— পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আবিসিনা নামে যিনি পরিচিত; তার পাণ্ডিত্যের জন্য প্রায়শই তাকে গ্রিক চিকিৎসাবিদ গ্যালেনের সাথে তুলনা করা হয়। ইবনে সিনাকে বলা হয়ে থাকে ইসলামের গ্যালেন। বিশ্বব্যাপী বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে তার জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে থাকে। ১৯৩৭ সালে ইবনে সিনার মৃত্যুর ৯০০ বছর পর তুরস্ক প্রথম তার জন্মোৎসব উদযাপন করে।

দর্শনশাস্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তার অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ ১৯৮০ সালে ইউনেস্কোর সকল সদস্য রাষ্ট্র মিলে ইবনে সিনার জন্মের হাজার বছর পূর্তি উদযাপন করে। ইবনে সিনা আফশানায় জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমানকালের উজবেকিস্তানে অবস্থিত। একুশ বছর বয়সে তিনি পারস্যে পাড়ি জমান এবং জীবনের বাকিটা সময় পারস্যের বিভিন্ন শহরে কাটান। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বিখ্যাত দার্শনিক এবং চিকিৎসক। ইবনে সিনা তার পুরো জীবনে দুই শতাধিক বই লেখেন, যার মাঝে ছোটখাটো দু-একটি তার মাতৃভাষা ফারসিতে রচিত। বাদ বাকি সবই আরবি ভাষায় লেখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো— তার বিপুল এই কাজের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। তবে প্রায় ৬৮টির মতো বই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এখনো শোভা পাচ্ছে।

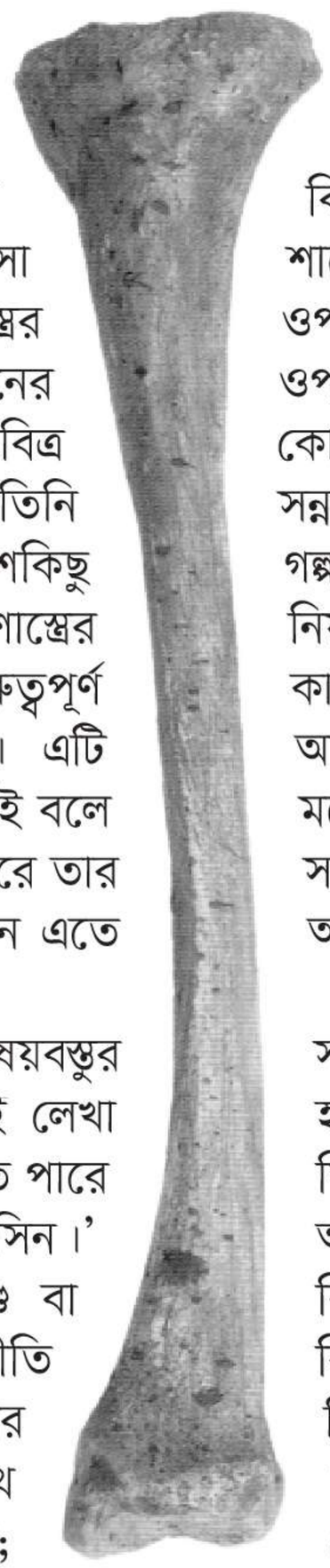

ইবনে সিনা বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বা বিষয়েই কলম ধরেছেন। তবে তার প্রিয় বিষয় ছিল দর্শন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান। আধুনিক কালের অনেক ইতিহাসবিদের মতে, চিকিৎসকের চেয়েও দার্শনিক পরিচয়টিই ইবনে সিনার জন্য যথোপযুক্ত। আবার, বাকিদের মতে তিনি হলেন— মধ্যযুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের রাজপুত্র। ইবনে সিনার কাজ বা লেখালেখির বেশিরভাগই চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর। এ বিষয়ে তিনি প্রায় ৪৩টি বই লিখেছেন। এ ছাড়াও দর্শনশাস্ত্রের ওপর ২৪টি, পদার্থবিদ্যার ওপর ২৬টি, ধর্মতত্ত্বের ওপর ৩১টি, মনোবিজ্ঞানের ওপর ২৩টি, গণিতের ওপর ১৫টি, যুক্তিবিদ্যার ওপর ২২টি, এবং পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাবিষয়ক ৫টি বই লিখেছেন। শুধু এগুলোই নয়, তিনি সন্ন্যাস, প্রেম এবং সংগীতের ওপরেও বই রচনা করেছেন। ইবনে সিনা বেশকিছু গল্পও লিখেছেন। তার রচিত 'আল-কানুন ফি আল-তিব' বা 'চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন' গ্রন্থটিকে বিবেচনা করা হয় ইবনে সিনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে। ইংরেজিতে এই বইটি ক্যানন নামেই সমধিক পরিচিত। এটি আরবি ভাষায় এবং আজ পর্যন্ত রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় বই বলে মনে করা হয় এই ক্যাননকে। কারণ, ইবনে সিনা আদিকাল থেকে শুরু করে তার সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল সভ্যতার লব্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল প্রকার জ্ঞান এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১২ শতকের দিকে ক্যাননের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পর্যালোচনামূলক বিভিন্ন বই লেখা হতে থাকে। এর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংক্ষিপ্ত রূপ বলা যেতে পারে সিরিয়ার ইবনে আল-নাফিসের লেখা 'দ্য কনসাইস বুক অব মেডিসিন।' আল-নাফিস ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃতুবরণ করেন। ক্যানন মূলত পাঁচটি খণ্ড বা বিষয়ের সম্মিলন। প্রথম খণ্ডটি চিকিৎসাশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মনীতি বিষয়ক, দ্বিতীয়টি ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ক, তৃতীয়টি শরীরের বিভিন্ন অংশের নির্দিষ্ট রোগবিষয়ক, চতুর্থটি যেসব রোগ শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত নয় তার বিষয়ে এবং সেই সাথে বিভিন্ন আঘাতবিষয়ক; যেমন— ফ্র্যাকচার বা অস্থির সরে যাওয়া

মুসলিম পর্যটকরা বিশ্ব ভ্রমণ করে তাদের প্রত্যক্ষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

নগর পরিকল্পনা

সুন্দর জীবন

[মুসলিম সভ্যতার সমৃদ্ধ নগরজীবন]

অবদান– কিছু পুরনো শহরে এখনো প্রাচীন রাস্তা অক্ষত অবস্থায় দেখা যায়– যা থেকে ১০০০ বছর আগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়
স্থান– কর্ডোভা থেকে দামেস্ক ও বাগদাদ পর্যন্ত
সময়– ৮ম থেকে ১৬ শতক

যদি কখনো আপনার মনে হয়— ইশ, আপনি যদি অতীতে চলে গিয়ে ১০০০ বছর আগে শহরগুলো কেমন ছিল তা দেখতে পেতে পারতেন, তাহলে বলতে হবে আপনার কপাল ভালো। স্পেনের কর্ডোভা ও সেভিল নগরের পুরনো শহরগুলো এখনো তাদের অতীতের সৌন্দর্য ধরে রেখেছে— যা থেকে অনুধাবন করা যায় শত শত বছর আগে মুসলিম শাসনামালে জীবনযাত্রা কেমন ছিল। মুসলিমদের ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে মসজিদগুলো। আর মসজিদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম শহরগুলো গড়ে উঠত। এর পাশে থাকত বাজার— যেখানে সওদাগরেরা খাদ্যদ্রব্য, মসলাপাতি, মোমবাতি, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি বিক্রি করত। ব্যবসায়িক স্থানসমূহে গড়ে উঠত বইয়ের দোকান, গ্রন্থাগার এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

বস্তুতপক্ষেই, মুসলিম সমাজে তৎকালীন হাসপাতালগুলোর ভূমিকা ছিল ব্যাপক। হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা দেওয়া হতো, রোগীরা এখানে অবস্থান করে আরোগ্য লাভ করতেন। এর পাশাপাশি এখানে মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ মানুষদেরও আশ্রয় দেওয়া হতো। এ ছাড়া, বিশেষত গরিব লোকেদের জন্য হাসপাতালগুলো অবসর যাপনের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। মুসলিম সভ্যতায় এ ধরনের হাসপাতাল প্রথম তৈরি হয় দামেস্ক ও বাগদাদে। এরপর কায়রোতে ৮৭২ থেকে ৮৭৪ সালের মধ্যে আহমাদ ইবনে তুলুন হাসপাতাল তৈরি করা হয়। প্রতিটি শহরে গোসলখানা বা হাম্মাম থাকত। এগুলো সুন্দর ভবনে তৈরি করা হতো। দামি টাইলস, ঝরনা, সুসজ্জিত পুকুর ইত্যাদি ছিল এসব হাম্মামের বৈশিষ্ট্য। হাম্মামগুলোর ব্যবস্থাপনার উষ্ণ কক্ষে কবোষ্ণ পানিতে গোসলের ব্যবস্থাপনা ছিল প্রতিটি মুসলমানের

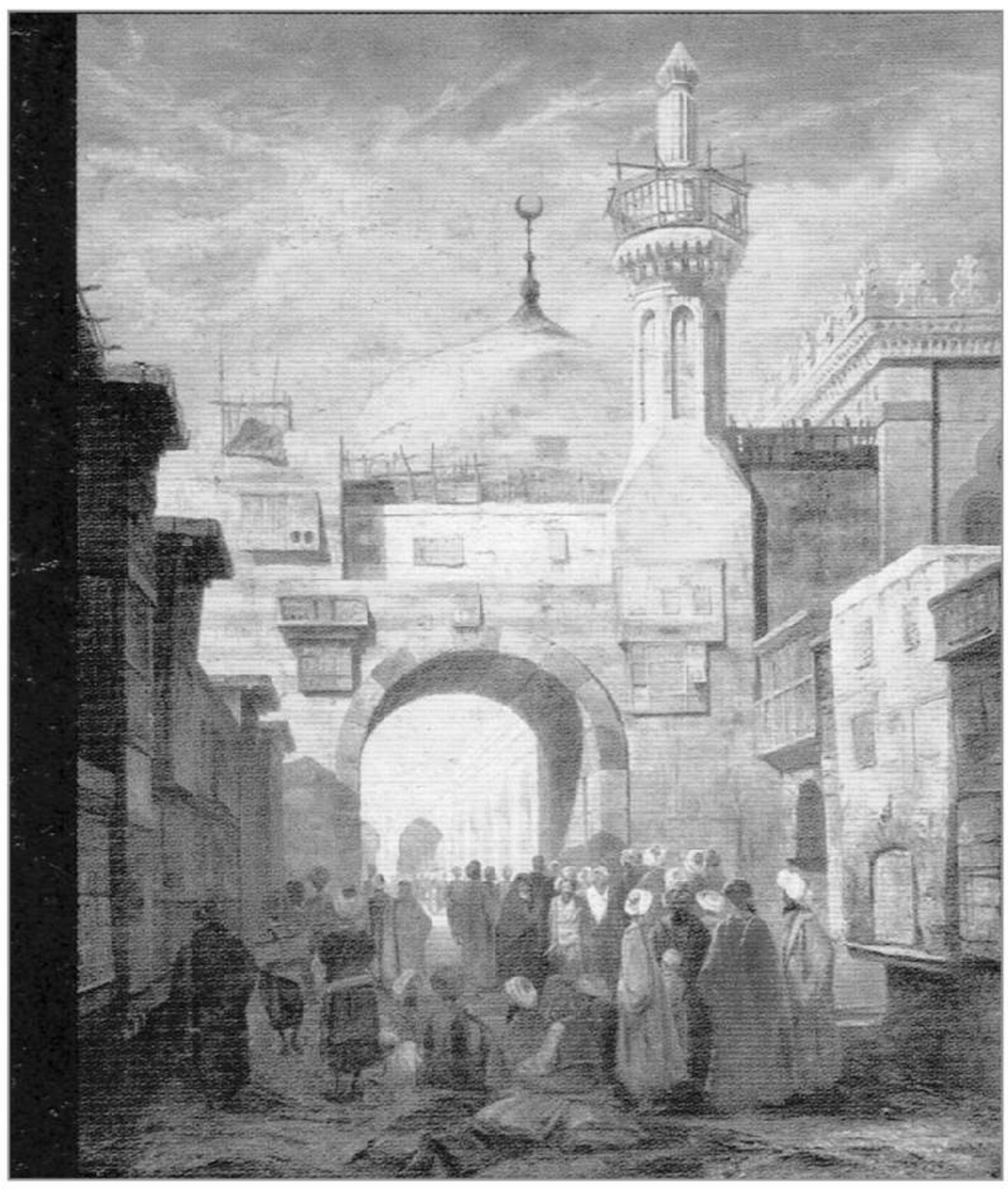

কায়রোর আল-আজহার মসজিদটি ৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল-আজহার মসজিদটির এই ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৮৩১ সালে। মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিল এই মসজিদ। বাড়িঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ একে কেন্দ্র করে চারদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রত্ন চেনার উপায়

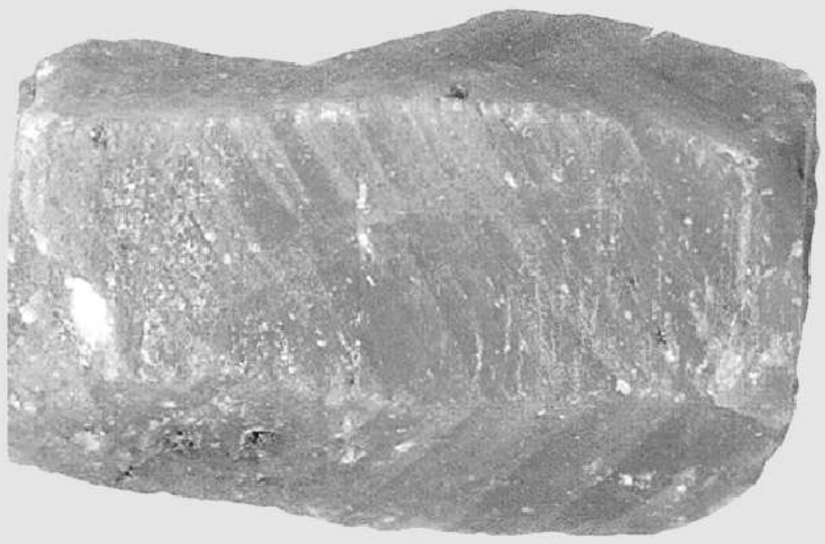

খনিজ এবং রত্ন পাথর প্রাচীনকালের মানুষদের মুগ্ধ করত।

এগারো শতকের বিজ্ঞানী আল-বিরুনি তার হাউ টু রিকগনাইজ জেমস নামক বইয়ে মূল্যবান রত্ন চেনার উপায় বর্ণনা করে গেছেন। তার ভাষায়, ভারত থেকে আসা কাঁচা নুড়ি কেনার পর সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি আরও লাল বর্ণ ধারণ করে। এগুলোর মধ্যে দুটি ছিল খুব গাঢ় রঙের। একটি গাঢ় লাল আর অন্যটি খানিকটা কম। দুটো খণ্ডকেই ধাতু গলাবার পাত্রে নিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং পঞ্চাশ মিসকাল সোনা গলাবার জন্য যে সময় প্রয়োজন ততক্ষণ তাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখা হয়। ঠাণ্ডা হওয়ার পর দেখা গেল কম লাল খণ্ডটি ঠিক লাল গোলাপের মতো রং ধারণ করেছে। আর গাঢ় লাল রঙের খণ্ডটি এর রং হারিয়ে 'সারানদিব স্ফটিক' (শ্রীলঙ্কার স্ফটিক)-এর বর্ণ ধারণ করেছে। এই খণ্ডটি পরীক্ষা করার পর দেখা গেল— এটি চুনির চেয়েও নরম। যদি তাপ প্রয়োগের ফলে কোনো নুড়ি লাল রং হারায়, তবে সেটা চুনি নয়। আবার এর মানে এই নয়— কোনো উত্তপ্ত ধাতু লাল থাকলেই সেটা চুনি। কারণ উত্তপ্ত করার পর লোহাও লাল বর্ণ ধারণ করে।

১১ শতকের বিজ্ঞানী আল-বিরুনি রুবি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।
উদ্ধৃত অংশটি তার বই 'ট্রিটিজ' বইয়ের কীভাবে রত্ন চিনতে হয় নামক অধ্যায় থেকে নেওয়া।

একমাত্র মুসলিম পণ্ডিত নন, যিনি জ্ঞানের সীমানা ডিঙ্গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এক্ষেত্রে ইবনে সিনারও সমসাময়িক আল-বিরুনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি একটি অবশ্য স্মরণীয় নাম। আল-বিরুনি ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র একটি বিষয়ের অবতারণা করে আল-বিরুনিকে পরিপূর্ণভাবে জানা অসম্ভব। কারণ তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুর লেখালেখি করে গেছেন। যার মধ্যে রয়েছে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, ঔষধবিদ্যা এবং ভূতত্ত্ব বা খনিজবিদ্যার মতো বিষয়।

আল-বিরুনি তার জীবনের একটি বড় অংশ ভারতে অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি ভারতের ভাষা শেখেন এবং সেখানকার মানুষ, ধর্ম এবং বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা এবং গবেষণা করেন। এই বিষয়গুলোই স্থান পেয়েছে তার সুবিশাল বই ক্রনিকলস অব ইন্ডিয়াতে। হিন্দির পাশাপাশি তিনি সংস্কৃত, গ্রিক এবং সিরীয় ভাষাও জানতেন। যদিও তার সব বই-ই তিনি আরবি এবং ফারসি ভাষায় লিখে গেছেন। ভারতে কাটানো সময়ে আল-বিরুনি ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং ভূতত্ত্ব বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেন। এ ছাড়া সফলতার সাথে তিনি নিখুঁতভাবে গঙ্গা অববাহিকার পলিমাটি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাউ টু রিকগনাইজ জেমস নামের বইটি তার খনিজবিদ্যার ওপর কাজের অন্যতম নিদর্শন এবং এই বইটিই তাকে এ বিষয়ের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ভূতত্ত্ব বা ভূ-বিজ্ঞানে আরও যে সকল মুসলিম বিজ্ঞানী অবদান রেখে গেছেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ক'জন বা কয়েকজন হলেন ইয়াহিয়া ইবনে মাসাবাহ (মৃত্যু ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ), আল-কিন্দি (মৃত্যু ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি), আল-হামাদানি প্রমুখ। ইবনে মাসাবাহর রচিত বইয়ের নাম জেমস অ্যান্ড দেয়ার প্রোপারটিজ।

একজন শিল্পীর চিত্রে আল-ইদ্রিসিকে সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের আদালতে তার বৃত্তাকার মানচিত্রসহ দেখানো হয়েছে। আল-ইদ্রিসি দাবি করেছিলেন পৃথিবী গোলাকার।

যাওয়া তথ্য এবং অন্যান্য রচনা সহজ ভাষায় সংকলন করেন। আল-বাকরী ছিলেন স্পেনের হুয়েল এবং সল্টস প্রদেশের গভর্নরের ছেলে। তিনি সেভিলের দরবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্বেও ছিলেন। তার অত্যন্ত ব্যস্ত দাপ্তরিক দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি একজন দক্ষ পণ্ডিত এবং প্রবন্ধকার ছিলেন। তিনি আরব উপদ্বীপগুলোর ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বই লিখেছিলেন, যার মধ্যে বিভিন্ন স্থানের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ণনাক্রমিক অনুযায়ী রাস্তা ও রাজ্যের গ্রাম, শহর, উপত্যকা এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলোর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি বিশ্বকোষ।

স্পেনের গ্রানাডার গভর্নরের সেক্রেটারি ছিলেন ভ্যালেন্সিয়ার ইবনে জুবায়ের, যিনি মক্কাতে তার হজ যাত্রার পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ৭০০ বছর পুরনো ভ্রমণবিষয়ক বইটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলো সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে। তার ভ্রমণপথে দেখা রাস্তা, গাছ, কিংবা রান্নাবিষয়ক তথ্য এবং বিভিন্ন ভ্রমণবিষয়ক পরামর্শ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি প্রচলিত ভূগোলবিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে অনবদ্য এই বই রচনা করেন। মুসলিম স্পেনে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার কাজটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলেই আল-ইদ্রিসি তার সময়কালীন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভা থেকে সিসিলিতে আসার জন্য এবং সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের জন্য একটি মানচিত্র তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি এই কাজে প্রায় ১৫ বছর ব্যয় করেন। তিনি পালেরমোর দরবারে রাজার একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি হাজার হাজার

০৫. মানচিত্র

মানচিত্রগুলো প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে মানুষকে তাদের পথ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে চলেছে— প্রথম দিকে কাদামাটির ফলকে খোদাই করা ছিল যা। কাগজের আবিষ্কার মানচিত্র তৈরির পদ্ধতিকে একলাফে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়। তবে সাম্প্রতিকালে কার্টো-গ্রাফিকাল বিপ্লব কিংবা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি বা জিআইএসের মাধ্যমে মানচিত্র অন্য এক মাত্রা লাভ করেছে। ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ডিজিটাল মানচিত্রের দেখা মেলে ইংল্যান্ডে এবং এরপর ১৯৯৫ সালের মধ্যে সমগ্র উন্নত বিশ্বই ডিজিটাল মানচিত্রের অধীনে চলে আসে। এই আধুনিক প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীর অবস্থান গণনা করার জন্য উপগ্রহ এবং রিসিভারগুলো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে। তবে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে মূলত ভ্রমণকারী এবং তীর্থযাত্রীদের বর্ণনা থেকেই মানচিত্র তৈরি করা হতো। সপ্তম শতাব্দীর মুসলিমদের ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসেছিল। তারা বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় কারণে তাদের চারপাশের দুনিয়াকে জানবার নেশায় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তারা পায়ে হেঁটেই ভ্রমণ করতেন, কখনো কখনো কেবল নতুন জায়গা সম্পর্কে জানবার আগ্রহে। ফিরে আসবার পর তারা যেসব লোক এবং দর্শনীয় স্থানগুলো দেখেছেন সেগুলোর বিবরণ দিতে থাকেন। প্রথম প্রথম শুধু মুখে মুখেই এই অভিজ্ঞতার গল্পগুলো ঘুরে বেড়াত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর বাগদাদে কাগজ প্রচলনের সাথে সাথে মানচিত্র এবং ভ্রমণ গাইড তৈরি শুরু হয়। নিজ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঠিকানায় বার্তা পৌঁছাতে পোস্টমাস্টারদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আব্বাসীয় খালিফা মানচিত্র তৈরির নির্দেশ দেন। এর ফলে সঠিক পথের মানচিত্রের সাথে সাথে দূরবর্তী এলাকাসমূহের মানচিত্র, সেসব এলাকার ভূমির গঠন, উৎপাদন ক্ষমতা এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপসহ নানা বিষয় লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে।

> “কলম্বাস আরবি মানচিত্র অধ্যয়ন করেছিলেন... ইহুদি বা মুসলিমদের দক্ষতা না থাকলে স্পেন ১৬ শতকে ইউরোপের বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তি হয়ে উঠত না।”
>
> **—রাগেহ ওমর**
>
> **বিবিসির ডকুমেন্টারি সিরিজ অ্যান ইসলামিক হিস্ট্রি অব ইউরোপ**

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর ভাইকিংসরা ছাড়া মূলত আর কোনো ইউরোপিয়ানই মুসলিমদের মতো সারা বিশ্বভ্রমণে বের হয়নি। ফলে তাদের জ্ঞান শুধুমাত্র ইউরোপের আশেপাশের এলাকাগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রতিফলন দেখা যায় তাদের তৈরি মানচিত্রগুলোতে, যেগুলোর বেশির ভাগই তৈরি করেছিল ধর্মীয় কর্তৃপক্ষরা। মুসলিম বিশ্বের ভূগোলবিদরা যদি তাদের মানচিত্র তৈরির কাজ এগিয়ে না নিতেন, তবে হয়তো ১৫ ও ১৬ শতকের অভিযাত্রীরা তাদের অভিযানে বেরুতেই পারতেন না। আমরা এখন যে মানচিত্রগুলো দেখি, এগুলো মূলত ইউরোপিয়ান ধাঁচে তৈরি করা। কিন্তু এগুলো মাত্র কয়েক শতাব্দী পুরনো। বর্তমানে মানচিত্রের উপরের দিকটিকে ধরা হয় উত্তর। কিন্তু এর আগে ইউরোপিয়ান মানচিত্রগুলোতে উপরের দিকটি পূর্বদিক হিসেবে ধরা হতো। মধ্যযুগের মানচিত্রগুলোতে পবিত্র নগরী হিসেবে জেরুজালেমকে সবসময় মানচিত্রের উপরের দিকে কিংবা কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হতো। ইসলামি মানচিত্র ও ইউরোপীয়দের মধ্যে মূল যে পার্থক্য ছিল তা হলো— মুসলমানরা সাধারণত মানচিত্রের উপরের দিকটি দক্ষিণে ও নিচের দিকটি উত্তর হিসেবে বিবেচনা করতেন। তবে, পশ্চিমা বিশ্বে এর ঠিক উল্টো করে মানচিত্র আঁকা শুরু হয়। ১৯২৯ সালে তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরে কর্মরত পণ্ডিতরা পিরি ইবনে হাজ মুহাম্মাদ রেইস (অর্থাৎ অ্যাডমিরাল) নামে ১৬ শতাব্দীর একজন তুর্কি

প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে শব্দ-সাজানোর ধাঁধা (crossword puzzle) প্রকাশ করত। যারা দ্রুততম সময়ে ধাঁধার সমাধান বের করতে পারত, তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সংকেত উদ্ধারকারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হতো।

বিমান ডাক

আজকে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের কাছে খুবই সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু একসময় কবুতরের ডাক-ই ছিল একমাত্র বিদ্যমান 'বিমান ডাক'। কবুতর বিষয়ক একটি বইয়ে মুসলিম পণ্ডিত ইবনে আবদ আদ-দাহির লেখেন, 'সে সময়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল, কায়রোর নগরদুর্গের চিলেকোঠায় প্রায় ১,৯০০ কবুতর ছিল।' মুসলিম কাহিনিকার আল-নুওয়াইরি দশম শতাব্দীর ফাতিমি খলিফা আল-আজিজের একটি কাহিনি বর্ণনা করেছেন, একবার খলিফা চেরিজাতীয় এক প্রকার তাজা ফল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যা কেবল এন্টিওকেই (প্রাচীন গ্রিসের একটি শহর, বর্তমানে এর অবস্থান তুরস্কে) পাওয়া যেত। পত্রবাহক কবুতর মারফত খলিফার আদেশ এন্টিওকের নিকটবর্তী বালবেকে (লেবাননের একটি স্থান) পাঠানো হলো। এরপর সেখান থেকে ৬০০ কবুতর ছেড়ে দেয়া হয়, যাদের প্রত্যেকটির পায়ের সাথে বাঁধা ছিল একটি করে চেরি ফল ভর্তি রেশমি ব্যাগ। অর্থাৎ ৬০০ কবুতরের দুই পায়ের সাথে বেঁধে মোট ১২০০ চেরি ফল পাঠানো হয়েছিল। ইচ্ছা প্রকাশের মাত্র তিন দিন পরেই খলিফার সামনে একটি বিশাল পাত্রে লেবানন থেকে আনা ১২০০ তাজা চেরি ফল পরিবেশন করা হয়, যা বিশেষ 'কবুতর ডাক' বা 'বিমান ডাকে' পরিবহন করা হয়েছিল।

একটি ইনিগমা বা ধাঁধা যন্ত্র— যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক বার্তা সংকেতে রূপান্তরের কাজে ব্যবহৃত হতো। নবম শতাব্দীতে আল-কিন্দি সংকেতলিপি বিদ্যার ভিত্তি রচনা করেন।

সংকেতলিপি উদ্ধার প্রণালী

আল-কিন্দি তার নবম শতাব্দীর সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার সম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপিতে লেখেন, 'সাংকেতিক বার্তা উদ্ধারের একটা পদ্ধতি হলো— যদি আমরা এর ভাষা জানি, তাহলে সেই ভাষারই একটি ভিন্ন সরললিপি খুঁজে বের করা, যা একটা শিট বা এরূপ কিছু পূরণে যথেষ্ট। তারপর আমরা প্রত্যেকটি বর্ণের পুনরাবৃত্তি গণনা করব। আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্ণকে বলব 'প্রথম', দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবহৃত বর্ণকে 'দ্বিতীয়' এবং পরবর্তী সর্বোচ্চ ব্যবহৃত বর্ণকে 'তৃতীয়', এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না সরললিপি নমুনার প্রত্যেকটি ভিন্ন বর্ণের গণনা শেষ হয়। এবার আমরা সাংকেতিক লেখাটির দিকে লক্ষ করি— আমরা যেটার পাঠোদ্ধার করতে চাচ্ছি, আমরা এর প্রতীকগুলোরও শ্রেণিবিন্যাস করব। আমরা এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রতীককে খুঁজে বের করব এবং একে সরললিপির সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্ণে রূপান্তর করব। এভাবে আমরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবহৃত প্রতীককের অনুরূপ ব্যবহৃত বর্ণে রূপান্তর করব— এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না সবগুলো প্রতীকের মর্ম উদ্ধার হয়।'

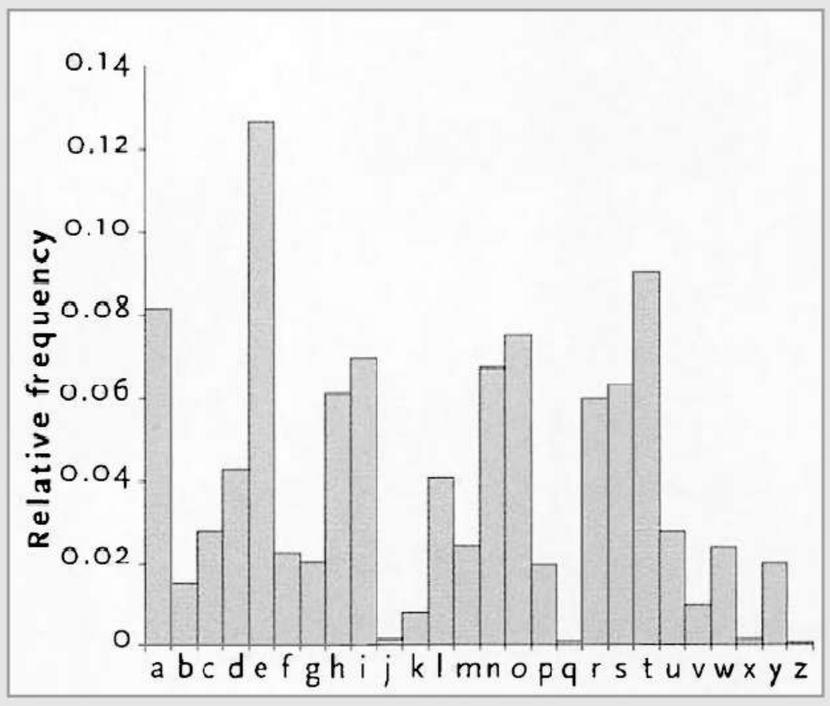

চার্টটিতে একটি রচনাংশের মধ্যে বর্ণের তুলনাঙ্ক দেখানো হয়েছে।

‘আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ—
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।’
— কুরআন (২১ : ৩৩)

অষ্টম অধ্যায়
মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আবিষ্কার

[জ্যোতির্বিদ্যা। মানমন্দির। জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্র। অ্যাস্ট্রোলেব। আর্মিলারি স্ফেয়ার। জ্ঞানী ব্যাক্তিদের নিদর্শন। চাঁদ। লুনার ফর্মেশন বা তাঁদের কলঙ্ক। নক্ষত্রপুঞ্জ। উড্ডয়ন]

রাতের আকাশ এবং মহাজাগতিক তত্ত্ব হাজার বছর ধরে মানব-জাতির কাব্য, সংগীত, দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে— এমনকি কয়েক সহস্রাব্দ আগেও মুসলিম বিশ্বে এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেখানে অন্যরা রাতের আকাশে বিনিদ্র চোখে চেয়ে থাকত— সেখানে ১২০০ বছর আগেও স্বর্গীয় বিস্ময় মানুষকে প্রথমবারের মতো শূন্যে উড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জানা দরকার— তাদের প্রতিদিনের নামাজের সময় নির্ভর করে সূর্যের অবস্থানের ওপর অন্যদিকে, প্রত্যেক মুসলিমকে যার যার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মক্কার অভিমুখের বা কেবলামুখী হতে হয়। এ ছাড়া চক্রাকারে চাঁদের ঘূর্ণনের ওপর নির্ভর করে তৈরি হয় মুসলিম পঞ্জিকা। প্রয়োজনের তাগিদে মুসলিমরা কালজয়ী নানা আবিষ্কার; যেমন— অন্য গ্যালাক্সির সোলার-সিস্টেমের প্রথম রেকর্ড এবং দ্য থার্ড-ইনইকুইলিটি অব দ্য মুনস মোশন, এমনকি আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আরও রয়েছে— সেলেস্টিয়াল গ্লোবস, আর্মিলারি স্ফেয়ারস, ইউনিভার্সাল অ্যাস্ট্রোলেবস এবং সেকসট্যান্টস। এসব কিছুই আঠারো শতকের জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম পর্যবেক্ষণাগার থেকে একদম নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছিল।

আজ এসব স্টারগেজিং স্কলার এবং মহৎ মুসলিমদের কথা স্মরণে আসে যখন আমরা মাথার উপরে থাকা আকাশের দিকে তাকাই, কারণ চাঁদের বেশিরভাগ অংশ সেসব বিখ্যাতদের নাম ধারণ করে আছে এবং ১৬৫টির বেশি নক্ষত্রের আরবি নাম রয়েছে।

০১. জ্যোতির্বিদ্যা

মুসলমানরা কেন এত দীর্ঘকাল ধরে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিল? প্রথমত এখানে একটি ব্যবহারিক চাহিদা ছিল— সারাবছর ধরে দৈনিক নামাজের সময় নির্ধারণ করা হতো আকাশে সূর্যের অবস্থান সাপেক্ষে, কারণ নামাজের সময় হলো সূর্যোদয়কালে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সূর্যাস্তকালে এবং সায়াহ্নে। মুসলমানদের প্রত্যেকটি ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মক্কার অভিমুখ জানা দরকার ছিল আর এই অবস্থান নির্ধারণ করার একমাত্র পন্থা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে ছিল আকাশ সম্পর্কে অনেক আপ্তবাক্য— যা অনুসন্ধান করা জরুরি ছিল। চূড়ান্ত ভাবনার বিষয়টি ছিল দিনপঞ্জিকা। মুসলমানদের দিনপঞ্জিকাটি চাঁদের গতিবিধি নির্ভর করে তৈরি হয়েছিল। তাই মাস পরিবর্তিত হয় চাঁদের দশা এবং অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। অর্ধচন্দ্র দেখতে পাওয়ার পরই একেকটি মাস শুরু হয়। এটি বিশেষ করে পবিত্র মাস রমজানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময় মুসলমানরা এক মাস সারা দিন রোজা রাখে।

মুসলিম জ্যোতির্বিদরা ছিলেন দক্ষ যন্ত্র তৈরিকারক এবং আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। তৎকালের বিদ্যান ব্যক্তিরা প্রতি দুই সপ্তাহে গ্রহের অবস্থান মেপে সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিদিনের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতেন।

সকল ধর্মীয় প্রণোদনা থেকে জ্যোতির্বিদ্যা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রধান উদ্বেগের কারণ হিসেবে দাঁড়ায় এক সহস্রাব্দ বছর আগে এবং যার ফলস্বরূপ দৃশ্যমান হয় গত শতকের আবিষ্কার। রেনেসাঁ বিপ্লবের সময়কালের পনের শতকের বিখ্যাত একজন গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদ রেজিওমনট্যানাস ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে তার গবেষণা কাজের উৎস হিসেবে ব্যবহার করতেন— যেখানে নিকোলাস কোপার্নিকাস তার বই ডি রিভল্যুশনিবাসে এগারো ও দশ শতকের বিখ্যাত দুজন মুসলমান জ্যোতির্বিদ আল-জারকালি এবং আল-বাত্তানির নাম বার বার উল্লেখ করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধিকাংশ বৃহৎ আবিষ্কারই সংঘটিত হয়েছিল পূর্বের মানমন্দির থেকে অথচ প্রায় ৩০০ বছর ধরে মুসলমানরা স্পেনের টলেডোকে শাসন করেছেন— এটিই ছিল তখনকার সময়ের বিশ্ব-জ্যোতির্বিদ্যার কেন্দ্র। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সারণি সর্বপ্রথম এখানেই তৈরি হয়েছিল— যা ইউরোপে প্রায় দুই শতক ধরে কার্যকর ছিল।
মহাকাশ পর্যবেক্ষণ খুবই কঠিন কাজ ছিল— সমগ্র মহাকাশ জুড়ে দৈনিক সূর্য এবং চন্দ্রের অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা কাজ চালানো হতো। এটা সৌর স্থিতিমাপ নির্ণয় করতে সহায়ক ছিল এবং প্রতি দুই সপ্তাহের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রহের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের তথ্য মেপে বের করতে পারত।

উনিশ শতকে বাগদাদের খলিফা আল-মামুন একটি ইন্টেলেকচুয়াল একাডেমি নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম দ্য হাউজ অব উইজডম। সেখানে পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করা হতো, যেগুলো এখন হয়ত আমাদের স্কুলের পাঠ্যবিষয়। প্রথম যে পাণ্ডুলিপিটি আরবিতে অনুবাদ করা হয়, তা হলো এলেক্স-এন্ড্রিয়ান জোতির্বিদের টলেমিস গ্রেট ওয়ার্ক— যাতে একটি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বর্ণিত আছে— যেখানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং অন্যান্য নক্ষত্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। আলামাজেস্ট তৎকালীন আরবীয় পণ্ডিতদের কাছে পরবর্তী ৫০০ বছরের জন্য সৃষ্টিতত্ত্বের মূলনীতি হিসেবে সুপরিচিত ছিল। তখনো মুসলমানরা গ্রিকদের আবিষ্কৃত গণিতের পদ্ধতি থেকে অনেক উন্নত এবং এগিয়ে ছিল। বিশেষভাবে ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নয়ন— যা রেনেসাঁ বিপ্লবের পর পশ্চিমা জ্যোতির্বিদদের অনেক কাজে আসে। মহাকাশ গবেষণায় মুসলমান জোতির্বিদদের বিশাল অবদান রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জোতির্বিদ্যার প্রথম স্তর সৃষ্টিকারী বিখ্যাত পণ্ডিতদের পরিচয় এবং কর্ম আলাদা করে দেওয়া হলো—

অ্যাস্ট্রোলেবে খোদাই করা ডাটা টেবিলগুলো আপনাকে বিভিন্ন রকম গণনার কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। যেমন রাতের সময় বলার জন্য অ্যাস্ট্রোলেবের পেছনে একটি তারার সাথে একই ক্রমে লাইনে দাঁড়াবে, এটির উচ্চতা বের করার জন্য। যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ইঙ্গিত ফলকের উপর সঠিক উচ্চতা লাইনের উপর বসে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি রেটটি ঘুরাতে থাকুন এবং চাকার পরিধির সময় নির্ণয় করুন।

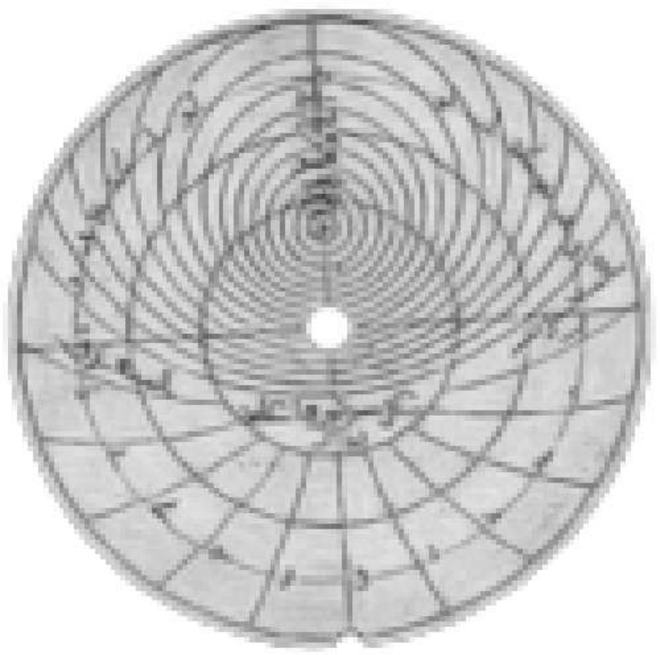

বাম, উপর এবং ডানের চিত্র— প্রতিটি ফলকের ওপর খোদাই করা লাইনগুলো ঊর্ধ্ব আকাশের পরিধির প্রক্ষিপ্ত ছবি। প্রতিটি ফলক একটি অক্ষাংশের সংকীর্ণ সারিকে আবৃত করে। (পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ অবস্থান।

কেন্দ্রের ছবি— অ্যাস্ট্রোলেবের মেটারটি একটি ফাঁপা ডিস্ক যেটি কয়েকটি সমতল ফলক রাখার জন্য যথেষ্ট গভীর।

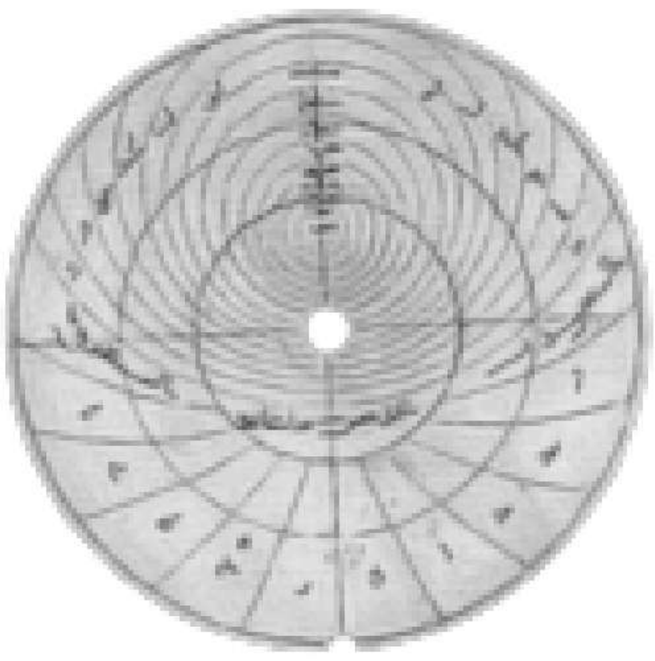

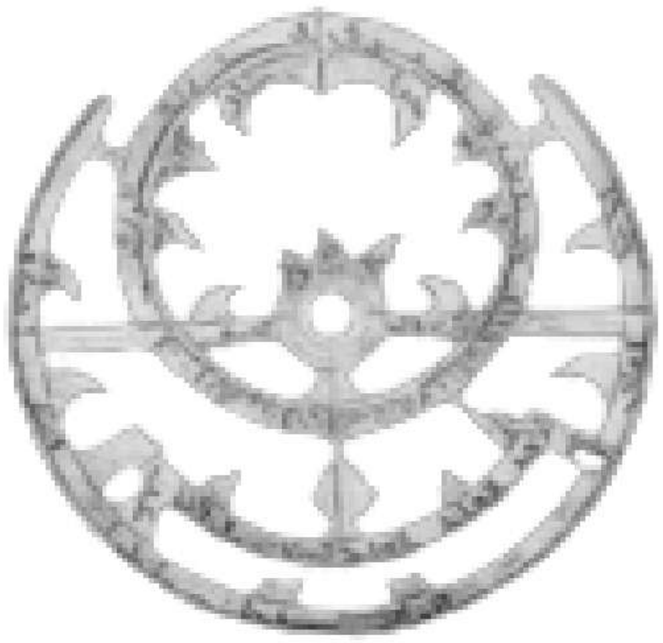

নিচের চিত্র— রেটে একটি বৃত্ত আছে যেটি সমগ্র আকাশ সূর্যের গমন পথ অনুসরণ করে এবং উজ্জ্বল তারার দিকে ইঙ্গিত করে। ছুরির আকৃতির পয়েন্টগুলো পূর্বের ইসলামিক অ্যাস্ট্রোলেব ছিল।

০৫. আর্মিলারি স্ফেয়ার

১৭৩২ সালে ইস্তাম্বুলে খোদাই কাজের মাধ্যমে একটি আর্মিলারি স্ফেয়ারের চিত্র অঙ্কন করা রয়েছে (জিহানুম বা সর্বজনীন ভূগোল)।

আর্মিলারি স্ফেয়ার আকাশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি যন্ত্র। জ্ঞানী মানুষরা বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করেছিলেন— তারা আকাশে যা দেখতেন তার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। পৃথিবীকে তারার একটি বলয় ঘিরে রেখেছে— এ ধরনের ধারণা থেকে মডেল তৈরি করা হয়েছিল। সেই সকল মডেলের অন্যতম একটি হচ্ছে আর্মিলারি স্ফেয়ার। আর্মিলারি স্ফেয়ার আকাশ ও গ্রহজনিত গতির আদলে তৈরি করা হয়েছিল— যার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছিলেন কীভাবে ত্রিমাত্রিকভাবে এই মহাবিশ্ব কাজ করে। পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলো অনেকটাই বর্তমান মডেলের মতোই। সেগুলো কঠিন গোলক দিয়ে তৈরি ছিল না, বরং সমকেন্দ্রিক গোলক দিয়ে তৈরি ছিল— যেখানে পৃথিবী কেন্দ্র এবং অন্যান্য সকল কিছু তাকে বেষ্টন করে অবস্থিত ছিল।

আর্মিলারি স্ফেয়ার নির্মাণ ও ব্যবহার শুরু হয়েছিল যখন এই বিষয় সম্পর্কে আল-ফাজারি অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট উইথ দ্যা রিং নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে দশম শতাব্দীতে তারা এ যন্ত্র নিয়ে একটি উচ্চতর বিতর্কিত পর্যায়ে চলে গিয়েছিলেন— যা দুটি মূল বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল। বাহ্যিকভাবে আর্মিলারি স্ফেয়ার পৃথিবীতে কেন্দ্রীভূত ছিল এবং গোলকের মডেলটি অয়নবৃত্তের চক্র (পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের স্পষ্ট পথ), বিষুবরেখা, ক্রান্তিরেখা, মেরু রেখা দিয়ে বেষ্টিত ছিল। এসকল কিছু সংঘটিত হয়েছিল আংশিক মাধ্যাহ্নিক চক্র দিয়ে এবং নিরক্ষরেখার ওপর ভিত্তি করে। চন্দ্র, গ্রহ এবং তারা এই মডেলের অংশ নয়; তবে তারা পৃথিবীর চারিদিকে অপেক্ষিক গতি দ্বারা অবস্থান করে।

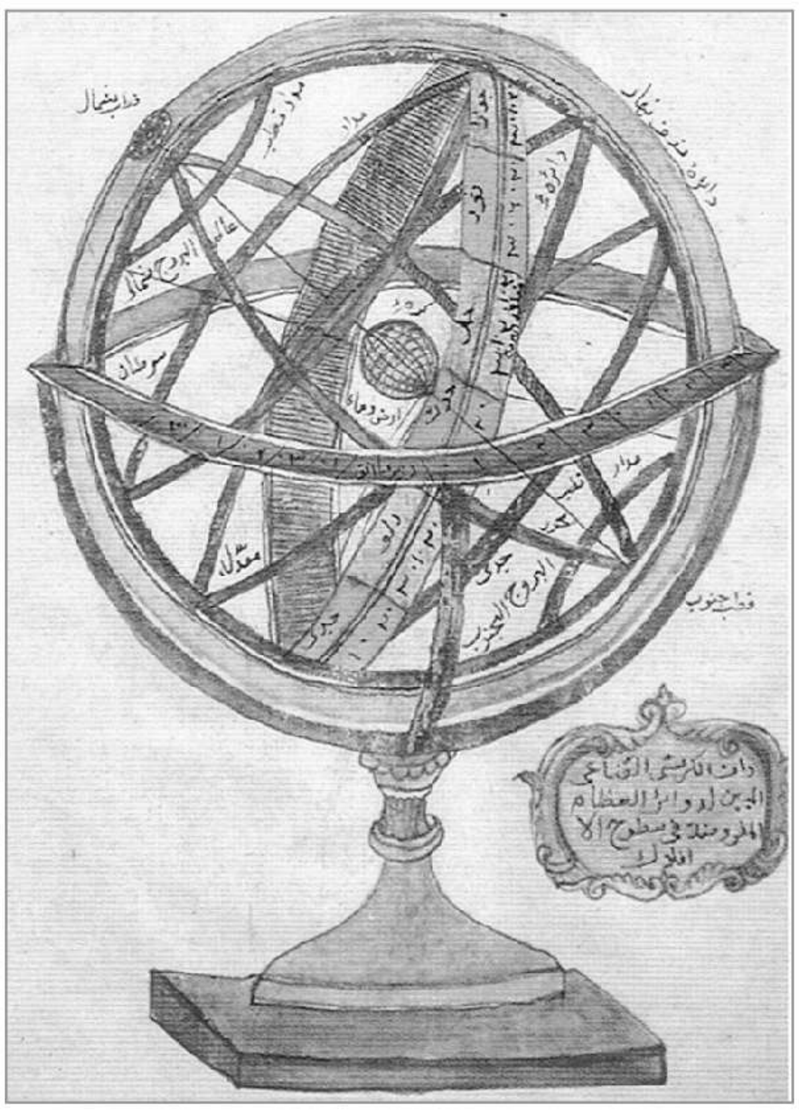

১৭ শতকের বিদ্যান ব্যক্তি কাতিব সেলেবির (হাজি খলিফা) লেখা আসল জিহান্নুমার পুনর্মুদ্রণ।

দ্বিতীয়টি ছিল অবজারভেশনাল আর্মিলারি স্ফেয়ার— যা ভিন্ন ছিল, কারণ এটির ক্ষেত্রে পৃথিবী কেন্দ্রে ছিল না কিন্তু চক্রে উচ্চ দৃশ্যমান যন্ত্র ছিল। এই গোলকগুলো বৃহৎ ছিল এবং স্থানাঙ্ক ও অন্যান্য মান নির্ধারণের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অনেক মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী অবজারভেশনাল আর্মিলারি স্ফেয়ার সম্পর্কে লিখেছিলেন। সেভিলের জাবির ইবনে আলফাহ যিনি পশ্চিমে জেবার নামে পরিচিত ছিলেন (ইনি রসায়নবিদ জেবার নয়) লিখেছেন মধ্যবর্তী দ্বাদশ শতাব্দীতে।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে লেখা টলেমির বর্ণনামূলক কাজ সিনট্যাক্সিস আরোপ করা হয়েছিল, যা মুসলিম বিশ্বে অ্যালমেজেস্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। আর্মিলারি স্ফেয়ারগুলো পৃথিবী ও আকাশ সম্পর্কে জানার জন্য নির্মিত মানমন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল; যেমন— ত্রয়োদশ শতাব্দীর মারাঘা মানমন্দির, পঞ্চদশ শতাব্দীর সামারখন্দ মানমন্দির এবং ষোড়শ শতাব্দীর ইস্তাম্বুলের মানমন্দির।

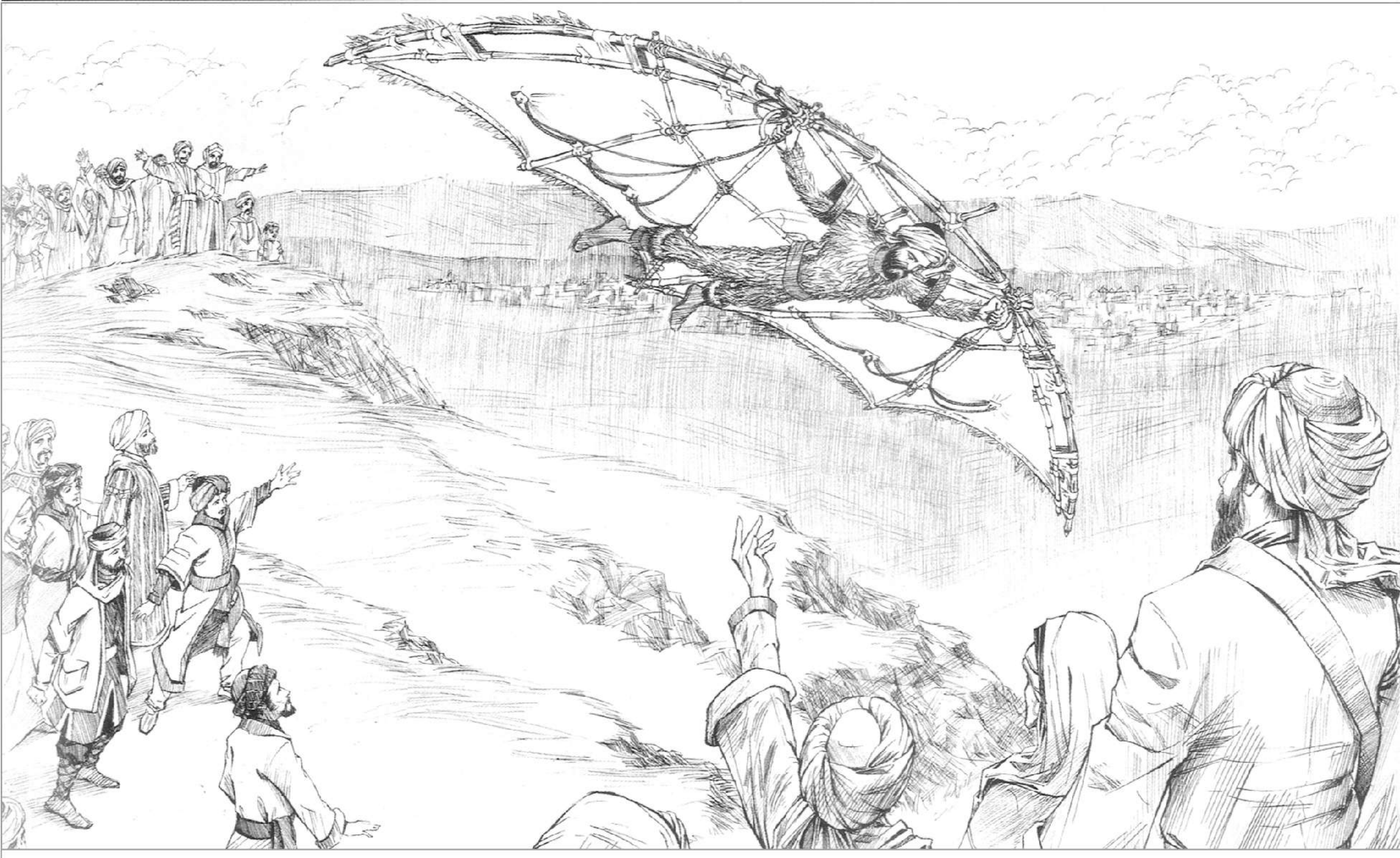

প্রথম মানুষ হিসেবে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের প্রথম সফল উড়ন্ত দৃশ্য দেখার শিল্পীসুলভ গভীর অনুভূতি।

ইবনে ফিরনাস ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার কোনো কাজ বা রচনার কিছুই আজ অবশিষ্ট নেই। কিছু কবিতা এবং তার সময়কালীন কাহিনীকারদের তথ্য থেকে তার জীবন সম্পর্কে সামান্য এই তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। ইবনে ফিরনাসের পর আরও অনেক মুসলিম কিংবা অমুসলিম ব্যক্তি আকাশে ওড়ার আকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটেছেন। উড্ডয়নের আরও বেশকিছু চেষ্টা করা হয়। ১০০২ খ্রিস্টাব্দে আল-জুহারি নামের এক তুর্কিস্তানি শিক্ষক কাঠ এবং দড়ি দিয়ে তৈরি পাখার সাহায্যে ওড়ার জন্য উলু মসজিদের মিনারের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়েন। কিন্তু মাটিতে পড়ে তৎক্ষণাত তিনি প্রাণ হারান। এরপর ১০১০ সালে একজন ইংরেজ বেনেডিক্ট সন্ত এইলমার অব ম্যালসবুরি ওড়ার চেষ্টায় নিজের দুই পা ভেঙে বসেন। তিনিও ইবনে ফিরনাসের মতো লেজের বিষয়টি এড়িয়ে যান। যার ফলে প্রায় ১৮৩ মিটার (৬০০ ফুট) উপর থেকে নেমে এসে মাটি স্পর্শ করার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন। এই দুই ঘটনার পর মানুষের উড়বার চেষ্টা হয়তো খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ এ সম্পর্কে আর তেমন কিছুই জানা যায় না। এরপর এ বিষয়ে যার প্রচেষ্টার কথা বলা যায় তিনি হলেন বিখ্যাত ফ্লোরেন্টাইন চিত্রশিল্পী এবং বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। লিওনার্দো সর্বপ্রথম আকাশে উড়বার ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক মতামত দেন। তিনি নিজে ওড়ার চেষ্টা না করলেও উড্ডয়ন বা উড়ন্ত যানের ওপর অসংখ্য আলোচনা এবং ছবি এঁকে গিয়েছেন। এই ছবিগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো মানুষের পিঠে বাধার মতো পাখির পাখার মতো দেখতে যন্ত্র বা অরনিথপটার। এ ছাড়াও তিনি গ্লাইডার এবং কারও কারও মতে হেলিকপ্টারেরও ছবি বা নকশা এঁকেছিলেন।

১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে লাগারি হাসান সেলেবি নামের একজন তুর্কি সর্বপ্রথম মানুষকে বহনযোগ্য রকেট আবিষ্কার করেন। এই রকেট ওড়ানোর জন্য তিনি জ্বালানি হিসেবে তিনশ পাউন্ড গান পাউডার ব্যবহার করেন। একজন চিত্রশিল্পীর ছবিতে এই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এ ঘটনা সম্পর্কে উইলিয়াম ই বারোস তার বই 'দিস নিউ ওশান : দ্য স্টোরি অব দ্য ফার্স্ট স্পেস এইজ' এ

ইয়াহিয়া ইবনে আস সাইগ, আভেমপেস নামে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত (১১৩৮); জারাগোজা, স্পেন; দার্শনিক, চিকিৎসক।

ইবনে বাসাল, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল-তুলায়তুলি (১০৮৫), টলেডো, স্পেন; উদ্ভিদবিদ, কৃষিবিদ এবং মালী।

ইবনে বতুতা, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ (১৩০৪-১৩৬৮/৭০), তাঞ্জিয়ার, মরক্কো; ভ্রমণকারী এবং কাহিনীকার।

ইবনে ফাদলান, আহমেদ (দশম শতক) বাগদাদ, ইরাক; অনুসন্ধানকারী, ভ্রমণকারী ও কাহিনীকার।

ইবনে ফিরনাস, আব্বাস (৮৮৭), কোরাহ, টাকুরানা, স্পেন; মানবতাবাদী, প্রযুক্তিবিদ ও রসায়নবিদ।

ইবনে হাওকাল, আবু আল-কাসিম মুহাম্মদ (৯২০-৯৯০); নিসিবিন, ইরাক; অনুসন্ধানকারী, ভ্রমণকারী এবং কাহিনীকার।

ইবনে হাযম, আবু মুহাম্মদ আলি ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ (৯৯৪-১০৬৪); কর্ডোভা, স্পেন; ধর্মতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

ইবনে ইসা, আলি (দশম শতক); যিশু হলি নামেও পরিচিত;, বাগদাদ, ইরাক, চিকিৎসক ও চক্ষু চিকিৎসক।

ইবনে জুবায়ের, আবু আল-হুসাইন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জুবায়ের (১২ শতক); গ্রানাডা, স্পেন; ভ্রমণকারী, অনুসন্ধানকারী এবং কাহিনী লেখক।

ইবনে জুলজুল আল-আন্দালুসি (৯৪৩); কর্ডোভা, স্পেন; চিকিৎসক, ভেষজবিদ ও ঔষধবিদা।

আলী ইবনে খালাফ, আল-সাকাজ (১১ শতক); টলেডো, স্পেন; ঔষধ প্রস্তুতকারী অথবা ভেষজবিদ, জ্যোতির্বিদ।

ইবনে খালদুন, আবদ আল-রহমান ইবনে মুহাম্মদ (১৩৩২-১৪০৬), টুনিস, তিউনিসিয়া; সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসিবিদ, দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ।

ইবনে খুররাহদাদবিহ (৮২০-৯১২); বাগদাদ, ইরাক; ভূগোলবিদ এবং বাগদাদের সরকারি ডাক বিভাগের পরিচালক।

ইবনে মাজিদ, সিহাব আল-দিন আহমেদ আল-নাজাদি (১৪৩২-১৫০০), নাজদ, সৌদি আরব; নাবিক।

ইবনে মুকলা, আবু আলি মুহাম্মদ (৮৬৬-৯৪০); বাগদাদ, ইরাক; আব্বাসীয় উজির, হস্তলেখক, হস্তলিখিত নকশির একজন আবিষ্কারক।

ইবনে রুশদ, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ আল-কুর্তুবি, অ্যাভেরোজ নামেও পরিচিত

(১১২৬-১১৯৮); কর্ডোভা, স্পেন; দার্শনিক, চিকিৎসক, মানবতাবাদী ও বিচারক।

ইবনে রুসতাহ, আহমেদ (দশক শতক); ইসফাহান, ইরান; অনুসন্ধানকারী ও ভূগোলবিদ।

ইবনে সাইদ আল-মাগরিবি (১২১৪-১২৭৪); গ্রানাডা, স্পেন; ইতিহাসবিদ, কবি, ভ্রমণকারী ও ভূগোলবিদ।

ইবনে সামাজুন (১০০২); আন্দালুসিয়া, স্পেন; ভেষজবিদ, উদ্ভিদবিদ, ও কম্পাউন্ডার।

ইবনে সারাবিয়ুন, ইয়ুহান্না, সেরাপিওন নামেও পরিচিত (নবম শতক); সিরিয়া; চিকিৎসক, কম্পাউন্ডার।

ইবনে সিনা, আবিসিনা নামেও পরিচিত (৯৮০-১০৩৭); বুখারা, উজবেকিস্তান; চিকিৎসক, দার্শনিক, গণিতবিদ, ও জ্যোতির্বিদ।

ইবনে তলাউন, আহমদ (৮৩৫-৮৮৪); প্রথমে

লেখক ও গ্রন্থসমূহ

এই বইয়ে উল্লিখিত মুসলিম পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি এবং তাদের সম্পর্কে লেখা গ্রন্থ, নিবন্ধ ও বইয়ের শিরোনাম সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা আছে এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

আদি বা প্রাথমিক গ্রন্থগুলো শনাক্ত করা বেশ কঠিন। যেহেতু এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এগুলোর আর তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই। এর কারণ হলো মধ্যযুগের যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গ্রন্থাগারগুলো পুড়ে যায় এবং মধ্যযুগের পণ্ডিতদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কয়েক শতক ধরে সংরক্ষণের অভাবে এই পাণ্ডুলিপিগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

হাজার হাজার আদি গ্রন্থ অনেক গ্রন্থাগারে তালিকাভুক্ত করে রাখা আছে এবং এখনো সেসব গ্রন্থাবলির কিছু কিছু সেখানে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন— প্রায় পাঁচ মিলিয়ন গ্রন্থের উপস্থিতি আছে এবং তার মধ্যে মাত্র ৬০,০০০টি গ্রন্থ সম্পাদন করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, অনেক গ্রন্থের অনুলিপি ও অনুবাদ কয়েক শতক ধরে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার (লন্ডন), তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘর গ্রন্থাগার (তুর্কি), সুলেয়মানি গ্রন্থাগার (তুর্কি), ঔষধের জাতীয় গ্রন্থাগার (যুক্তরাষ্ট্র), প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (যুক্তরাষ্ট্র), ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার, লেইডেন গ্রন্থাগার (হল্যান্ড) এবং ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (যুক্তরাজ্য)।

আবাস

কফি

আব্দ আল-কাদির ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারি আল-জাজিরি : উমদাদ আল-সাফা ফি হিল আল-কাহওয়া, আংশিক সম্পাদনা করেন দে স্যাসি, ক্রেসটোমাথি এরাবি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইম্প্রিমেরি রয়্যাল, প্যারিস ১৮২৬।

আব্দ আল-কাদির ইবনে শেখ ইবনে আল-আয়দারুস : সাফাত আল-সাফা ফি বায়ান হুকম আল-কাহওয়া। আলওয়ার্ট, ভারজেকনিস, বিবলিওথেক বার্লিন, এম এস ৫৪৭৯, ২৩
ভলিউম, বার্লিন, জার্মানি, ১৮৫৩-১৯১৪।

হ্যাটক্স, আর এস : কফি এবং কফি হাউজ, মধ্যযুগের পূর্বাঞ্চলের নিকটবর্তী সামাজিক পানীয়ের সূচনা। ওয়াশিংটন প্রেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিটল এবং লন্ডন, ১৯৮৮।

ঘড়ি

আল-জাজারি : আল-জামি বায়ান আল-ইলম

সাফিহা আল-জিজিয়া।

আর্মিলারি গোলক

দাউদ ইবন সুলায়মান : কিতাব দাত আল-হালাক অথবা আর্মিলারি গোলকের গ্রন্থ। সিকাত ৯৬৯/১ এ, কায়রো।

জাবির ইবনে আফলাহ : ইসলাহ আল-মাজিসতি। জ্যোতির্বিদ্যার অংশে দেখুন।

চন্দ্র বিন্যাস

আবু আল-ফিদা : মুকতাসার তারিখ আল-বাসার অথবা সংক্ষিপ্ত মানব ইতিহাস, কোরাম হাসান পাসা পাবলিক গ্রন্থাগার, ১১৭৪, কোরাম, তুর্কি।

আবু আল-ফিদা : তাকুইম আল-বুলদান। ভ্রমণকারী ও অনুসন্ধানকারী অংশে দেখুন।

মাশ আল্লাহ : আল-কিতাব আল-মারুফ বিল সাবি ওয়াল ইসরিন। অ্যাস্ট্রোল্যাব অংশে দেখুন।

মাশা আল্লাহ : কিতাব সানাত আল-এস্টোরলাবাত ওয়াল আমাল বিহা। অ্যাস্ট্রোলেব অংশে দেখুন।

আল-সুফি : সোয়ার আল-কাওয়াকিব আল-তাবিত, জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্র অংশে দেখুন।

আল-তুসি : তারকামা ই কিতাব ই সোয়ার আল-কাওয়াকিব, সুলেয়মানীয় গ্রন্থাগার, আয়া সুফীয়া সংগ্রহ, ২৫৯৫, ইস্তাম্বুল।

আল-তুসি : আল-তাদকিয়া ফি আল-হায়া, ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার ৩১৯/১, ভ্যাটিকান সিটি।

উলুঘ বেগ : আল-জিজ অথবা অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল টেবিলস, সোলায়মানীয় গ্রন্থাগার, আয়া সুফীয়া সংগ্রহ, এম এস ২৬৯২, ইস্তাম্বুল।

নক্ষত্রপুঞ্জ

আল-সুফি : সোয়ার আল-কাওয়াকিব আল-তাবিত, অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল যন্ত্র অংশে দেখুন।

উড্ডয়ন

আল-ফিরদাউসী : শাহনামেহ অথবা রাজার গ্রন্থ। আঙ্কারা জাতীয় গ্রন্থাগার, বি ৫৩০, আঙ্কারা, তুর্কি।

আল-ফিহরিস্ত : এর আক্ষরিক অর্থ 'সূচিপত্র' বা 'সূচক'। আল-ফিহরিস্ত হলো আরব এবং অনারব উভয়ের আরবিতে লেখা সমস্ত বইয়ের একটি সূচক। এটি লিখেছেন আবু আল-ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, তাকে ইবনে আল-নাদিমও বলা হয়। তিনি তার বাবার বইয়ের দোকানের ব্যবহারের জন্য লেখকদের এবং তাদের লেখনীর নামের এই তালিকা তৈরি করা শুরু করেছিলেন। বয়স বাড়ার সাথে তিনি বইয়ে পড়া বা বন্ধুবান্ধব ও ঘটনাচক্রে পরিচিতদের কাছ থেকে জানা অনেক বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই কেবল বইয়ের দোকানের একটি তালিকা হওয়ার পরিবর্তে আল-ফিহরিস্ত মধ্যযুগীয় ইসলামি সংস্কৃতির একটি বিশ্বকোষ হয়ে ওঠে।

ফিকহ : আক্ষরিক অর্থ হলো 'জানা ও বোঝা', মূলত এর মাধ্যমে শরীয়তের উৎসসমূহ থেকে শরিয়ত বোঝা ও তা প্রয়োগ করাকে বোঝায়।

আল-ফুসতাত : হলো ইসলামি মিশরের প্রথম রাজধানী, যা আমর ইবনুল আস কর্তৃক ৬৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভবত রোমান সামরিক শব্দ ফোসাত্যাম বা শিবিরের নামে নামকরণ করা হয়েছিল।

হাদিস : নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীসমূহের বর্ণনা, যা ইসলামি শরিয়তের একটি প্রধান উৎস। প্রতিটি হাদিসের একটি মূলপাঠ রয়েছে যার সত্যতা প্রত্যক্ষদর্শী এবং বর্ণনাকারীদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

হজ : সৌদি আরবের মক্কার উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা।

হাম্মাম : আরবি, গণস্নানাগার।

হারাম : অলঙ্ঘনীয়, অপবিত্র এবং নিষিদ্ধ।

ইফ্রিকিয়া : মধ্যযুগের ইতিহাসে ইফ্রিকিয়া বা ইফ্রিকিয়াহ ছিল বর্তমান লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং পূর্ব আলজেরিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত এলাকা। আধুনিক আরবি ভাষায় এই পরিভাষার অর্থ আফ্রিকা।

ইমাম : যিনি নামাজ পড়ান।

জাবাল আল-আরুস : স্পেনের কর্ডোভার একটি পাহাড়।

কাবা : আক্ষরিক অর্থ "সম্মান ও মর্যাদার উঁচু স্থান"। এটি সৌদি আরবের মক্কায় মসজিদে হারাম শরীফের কেন্দ্রে অবস্থিত পবিত্র স্থাপনা। এটি সেই কেন্দ্র যার দিকে মুখ করে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানেরা নামাজ আদায় করে। এটি পবিত্র কালো পাথর দ্বারা নির্মিত।

কিসওয়াহ : আক্ষরিক অর্থ আবরণ। প্রতি বছর

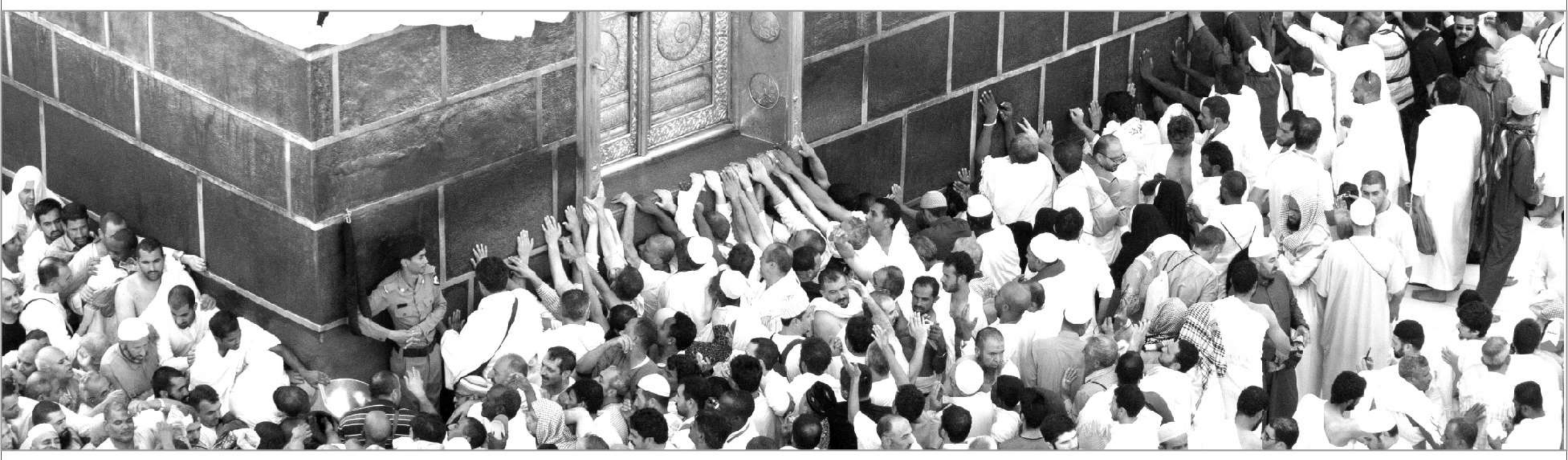

১০ জিলহজ পবিত্র কাবা নতুন কিসওয়া (কাপড়ের আবরণ) দ্বারা আবৃত করা হয়, যা হজের সাথে মিলে যায়। প্রতি বছর পুরোনো কিসওয়াটি সরিয়ে ফেলা হয়, ছোট টুকরো করে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি, পরিদর্শনকারী বিদেশি মুসলিম বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনকে উপহার দেওয়া হয়।

কোশক : কিয়স্ক এর তুর্কি পরিভাষা।

কুতুবিউন : হলো বই বাঁধাইকারীদের মরোক্কীয় আরবি নাম।

মাদরাসা : শব্দের অর্থ হলো বিদ্যালয় এবং আলাদাভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে মসজিদে আয়োজিত বক্তৃতা থেকেই মূলত মাদরাসা বিকশিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে